সম্মিলিত ভাবনা

৩

দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

সম্মিলিত ভাবনা ৩
Sammilita Bhabana 3

প্রথম প্রকাশ
৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

প্রকাশনায় :
দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

প্রচ্ছদ : সুশীল দাস

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি:
মেলারমাঠ ○ আগরতলা
ফোন : ০৩৮১-২৩২-৮৪৬৮
৯৪৩৬৫৮২৪৮৬

দাম : ২০ টাকা

প্রশ্ন : দ্য মার্ক্সিস্ট (জানুয়ারি–মার্চ,২০১৬)-এ সি পি আই-র কর্মসূচি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রকাশ কারাত সঠিকভাবেই জোর দিয়েছেন যে, বুর্জোয়ারা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে অক্ষম। এ বক্তব্য সি পি আই (এম)-র কর্মসূচি ৭.১ এবং ৭.২ অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ অন্য অংশের জারি করা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য বিকল্প মঞ্চ গঠনের ঘটনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, যা কিনা কমরেড স্তালিনের সুচিন্তিত বক্তব্যের বিরোধী ?

উত্তর : গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা বলতে আমরা কী বুঝি সে সম্পর্কে প্রথম পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমাদের পার্টির কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে কী বলা হয়েছে ? বলা হয়েছে, স্বাধীন ভারতের নতুন শাসকশ্রেণীগুলিরই দায়িত্ব ছিল সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্তব্য সম্পাদন করা। কিন্তু শাসকশ্রেণীর চরিত্র যেহেতু বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর জোট, যারা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে নিজেদের শ্রেণী শাসনের প্রতি হুমকির আশঙ্কায় অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে অনিচ্ছুক। আমাদের পার্টি কর্মসূচিতে বলা হয়েছে এই অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার দায়িত্ব একমাত্র পালন করতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এর অপরিহার্য কর্তব্য হবে, যেমন গ্রামীণ এলাকায়, আধা সামন্তবাদী সম্পর্ককে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে আমূল ভূমি সংস্কার এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিসরে এর অবশেষকে বিলুপ্ত করা। গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার অর্থ যদি আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই তা হলে তাকে গণতান্ত্রিক অধিকার কিংবা বুর্জোয়া গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের (জরুরি অবস্থার সময়ে যা ধ্বংস করা হয়েছিল) সংগ্রামের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সুযোগ থাকবে না।

ভারতের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রূপ হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র। এর যে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করার মৌল কর্তব্য প্রতিপালনে ব্যর্থতারই প্রতিফলন।

প্রশ্ন: অতি - বামপন্থা কোনও মতাদর্শ কি ? যদি তা না হয় তা হলে পার্টি কেন এই পরিভাষা ব্যবহার করছে এবং তাকে অনুমোদন দিচ্ছে ?

উত্তর: এটা অস্বীকার করা যায় না যে অতি বামপন্থা একটা রাজনৈতিক প্রবণতা, যাকে বুঝতে হবে এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে পার্টির ভেতরে ও জনগণের মধ্যে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। বলশেভিক পার্টিতে লেনিনকেও এই প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। এ নিয়ে লেনিন লিখলেন ‘ বামপন্থী কমিউনিজম ও শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা, নামের বিখ্যাত বইটি। অতি - বামপন্থা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমর্থক ও দরদিদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর ক্ষমতা রাখে, কারণ এরা মার্কসবাদী শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে এবং মার্কসবাদী মতাদর্শের প্রতি অনুরক্ত বলে প্রচার করে। অতি - বামপন্থীরা নিজেরা যে ধরনের কাজে লিপ্ত থাকে, যে ধরনের কর্মধারা অনুসরণ করে , একই ধারা অনুসরণ করতে অন্যদের উৎসাহ দেয়, যা প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিবন্ধক ও বিপ্লবী শক্তিগুলির সংহতি নাশক।

অবশ্য, একেক দেশে ও একেক সমাজে অতি- বামপন্থা বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করতে হবে। তবে এদের বিভিন্ন রূপের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মার্কসবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে তাদের যুক্তিহীন মতান্ধ বোঝাপড়া ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এরা সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট।

আমাদের দেশে অতি -বাম ধারায় বিশ্বাসী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কয়েকটি অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এরা সংসদীয় নির্বাচনী ব্যবস্থায় অংশ নেয় না, নির্বাচন বয়কটের আহ্বান জানায় এবং ট্রেড ইউনিয়নসহ কোনও ধরনের গণকার্যকলাপেই অংশ নেয় না। তাদের মতে গণকার্যকলাপ হচ্ছে এই ধরনের বিচ্যুতি, যা সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদকে উৎসাহিত করে। আসলে অতি - বামেদের এ ধরনের সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শ্রমজীবী জনগণ এবং জনগণের যে অংশ পুঁজিপতি- সাম্রাজ্যবাদী - সামন্তবাদী শক্তিগুলোর শোষণে পিষ্ট ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, তাদের সকলের মধ্যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে বাধা দেয়। সি পি আই (এম) এ কারণেই অতি বামপন্থাকে একটি বিচ্যুতি বলে আখ্যায়িত করে। এই বিচ্যুতি সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবী সংগ্রামকে দুর্বল করে। এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সি পি আই (এম) রাজনৈতিক লড়াইয়ে বিশ্বাসী এবং এর ক্ষতিকর ভূমিকা সম্পর্কে শুধু পার্টিসভ্য- দরদি দেরকেই নয়, সকল অংশের জনগণকে, যারা প্রকৃত সামাজিক - অর্থনৈতিক- রাজনৈতিক মুক্তি চায় ও তা অর্জনের জন্য সংগ্রাম চালাতে উৎসাহী, তাদের

সকলকেই সতর্ক ও সচেতন করতে সচেষ্ট থাকে। সতর্ক ও সচেতন করতে চায় এই কারণে, তারা যাতে অতি - বামেদের বিপ্লবী বুলি আওড়ানোর খপ্পরে না পড়ে। পার্টি বরং জনগণের ব্যাপক সমাবেশ ঘটানোর কাজে তারা যে ক্ষতি করছে তা সকলকে বোঝাতে চায়।

প্রশ্ন: প্রচার মাধ্যমে এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, কেরলের নবগঠিত বাম- গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার নাকি সবরিমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকারের বিরুদ্ধে আগেকার ইউ ডি এফ সরকার শীর্ষ আদালতে যে অবস্থান নিয়েছিল, তাকে সমর্থন জানিয়েছে। খবরটি সত্যি হলে তা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক। এ সম্পর্কে পার্টির অবস্থান জানতে চাই।

উত্তর: এ বিষয়ে পার্টির অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি। ২০০৭ সালে তখনকার বাম - গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামা দাখিল করেছিলো। সবরিমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকারের পক্ষেই ছিল এল ডি এফ সরকারের হলফনামা। বলা হয়েছিলো, 'মহিলাদের একাংশের মন্দিরে ঢোকার অধিকার কেড়ে নেওয়া অনুচিত।' হলফনামায় বাম- গণতান্ত্রিক সরকার মন্দিরে মহিলারা ঢুকলে মন্দির ও পূজার্চনা অপবিত্র হওয়ার যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

এটা দুর্ভাগ্যের যে, এরপর যখন ইউ ডি এফ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তারা নতুন করে শীর্ষ আদালতে হলফনামা পেশ করে। সেই হলফনামায় বাম-গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারের অবস্থানকে শুধু বাতিলই করা হয়নি, যা বলা হলো তা ছিলো একেবারে পশ্চাদ্মুখী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত। তারা 'মনুস্মৃতি'-র অনুশাসন উল্লেখ করে বলে যে যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা মন্দির ও পূজার্চনার পবিত্রতার ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ভারতীয় সংবিধানেই তা বলা হয়েছে। সুতরাং সংবিধানের ১৪ নং ধারায় পুজোর চিরায়ত অনুশাসনের যে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, লিঙ্গসাম্যের নামে তা পরিবর্তনের অধিকার কারও নেই। বাম- গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারের হলফনামা ইউ ডি এফ সরকার এভাবে প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা নতুন হলফনামা দাখিল করে।

এবার আবার বাম- গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিষয়টি শীর্ষ আদালতে ওঠে। পারস্পরিক আলোচনার ঘাটতির কারণে সরকারি আইনজীবী তৎক্ষণাৎ আদালতকে নতুন সরকারের অবস্থান না জানাতে পেরে আদালতের নিকট সময় চান।

তাতেই একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে নতুন সরকার হয়তো আগেকার বাম- গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারের অবস্থান থেকে সরে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই এটা লিঙ্গসাম্যের পক্ষে সি পি আই (এম)-র অবস্থানকে যারা প্রশংসা করেছিলেন তাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

অবশ্য এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সি পি আই (এম) কেরালা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কোডিয়ারী বালকৃষ্ণাণ প্রচার মাধ্যমকে বলেন যে সি পি আই (এম) সবরিমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকারের দাবিকে সমর্থন জানায়। তিনি আরও বলেন, কেরালা সরকার শীর্ষ আদালতে নতুন করে হলফনামা পেশ করবে। ঐ হলফনামায় পার্টির এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী কাদাকাম্পালি সুরেন্দনও এই কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন।

জাত ও লিঙ্গ নির্বিশেষে উপাসনাস্থলে জনগণের প্রবেশের অধিকার নিয়ে সি পি আই (এম) বহুকাল ধরে লড়াই চালিয়ে আসছে। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বেও এ কে গোপালনের মতো বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতারা দলিত ও নিম্নবর্ণের জনগণের মন্দিরে প্রবেশাধিকারের দাবিতে সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন। আজও তামিলনাড়ুতে আমাদের পার্টি তামিলনাড়ু অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ মঞ্চের সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় রয়েছে। দলিত অংশের জনগণের প্রতি এ ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই মঞ্চ সংগ্রাম জারি রেখেছে।

যারা এমন যুক্তি দাঁড় করাচ্ছেন যে বয়ঃসন্ধিকাল থেকে রজঃনিবৃত্তি পর্যন্ত মেয়েরা মাসের কয়েকটা দিন ' অপবিত্র' থাকে, তাই তাদের মন্দির ও পূজার্চনাস্থলে ঢোকা নিষিদ্ধই থাকা উচিত। সি পি আই (এম) এই যুক্তি সমর্থন করে না। কিছু কিছু মুসলিম ধর্মযাজকও একই যুক্তিতে মেয়েদের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। অপবিত্রতার যুক্তি দেখিয়ে যুগের পর যুগ ধরে আমাদের দেশের মহিলাদের নির্মম বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে এবং নানাভাবে তাদের হেনস্তা হতে হচ্ছে। অথচ এর কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি নেই। কুসংস্কার ও পুরুষশাসিত ব্যবস্থার প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবই এর একমাত্র কারণ। ধর্মীয়, ঘরোয়া কিংবা সামাজিক স্তরে মহিলাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পদক্ষেপ কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

প্রশ্ন: কেন্দ্রীয় সরকার যোগার প্রসারে ভূমিকা নিয়েছে। এ সম্পর্কে পার্টির অভিমত কী? এমনকি বাম শাসিত সরকারগুলিও বিদ্যালয় স্তরে যোগা চালু করার ঘোষণা দিচ্ছে। মানুষজন এই বলে তার সমালোচনা করছেন যে, এটা তো গেরুয়াকরণ

কর্মসূচিরই অঙ্গ।

উত্তর: যোগা এখন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। জনপ্রিয় হওয়ার কারণ শুধু এই নয় যে যোগার অন্তর্ভুক্ত কিছু আসন নানা ধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত মানুষদের জন্য দারুণ উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে, এমনকি যাদের তেমন কোনও শারীরিক সমস্যা নেই তাদের জন্যও এটা উপকারী। নিয়মিত যোগব্যায়াম অনুশীলন সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও মাংসপেশির নমনীয়তা বাড়াতে সাহায্য করে। শ্বাস- প্রশ্বাসের আসন ও মনকে উদ্বেগমুক্ত রাখার যোগা পদ্ধতি ও একমনে চোখ বুজে থাকার পদ্ধতিও সমান জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিছু উপকার পাচ্ছেন বলেই মানুষ এসব করছেন। সুতরাং সাধারণ মানুষজন ও বিদ্যালয় স্তরের ছেলে-মেয়েদের ও যুবাদের মধ্যে যোগা অনুশীলনে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। তবে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত করতে গিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে।

হিন্দুত্ববাদীরা যোগাকে হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ বলে বর্ণনা করে এবং তাকে ধর্মীয় রঙ দেয়। আমরা এ ধরনের মনোভাবের বিরোধী।

প্রথম কথা হচ্ছে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে যোগাকে ধর্মীয় রঙে রাঙানো উচিত নয়। যোগা অনুশীলনের সঙ্গে কোনও ধর্ম কিংবা ধর্মাচরণ যুক্ত করা যাবে না। যোগাসনের সঙ্গে শ্লোক বা মন্ত্রোচ্চারণের কোনও সম্পর্ক নেই। সুতরাং কোনও সরকার বা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগা চালুর সঙ্গে শ্লোক বা মন্ত্রোচ্চারণ নিষ্প্রয়োজন। এমনকি আসনের সময় ‘ ওম’ উচ্চারণ করাটাও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক।

কেরালায় আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদ্‌যাপনের সময় রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে শৈলজা প্রকাশ্যেই বলেছেন যোগাসন শুরু করার আগে মন্ত্রোচ্চারণ করে প্রার্থনার কোনও প্রয়োজনই পড়ে না।

এছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেগুলি যোগার প্রচার ও বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার সময় সব সরকারকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

প্রথমটি হচ্ছে, যোগা বিশেষজ্ঞরা সকলেই বলছেন ১০ বছরের আগে কোনও শিশুকে যোগাসন করতে দেওয়া ঠিক নয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যোগা শিক্ষক নিয়োগের সময় নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা এ ব্যাপারে যথাযথ ও শ্রমসাধ্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। শারীর শিক্ষায় ডিগ্রি পেলেই কাউকে যোগার শিক্ষক ভাবা চলবে না। এ সম্পর্কে সুদক্ষ ও অনুমোদিত যোগা প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিয়ে মানদণ্ড ঠিক করতে হবে। প্রশিক্ষণ ও যোগা শিক্ষক নিয়োগের সময় এই মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, অল্প সংখ্যক লোক কিংবা ছাত্রকে নিয়ে যোগার ক্লাস পরিচালনা করতে

হবে। কারণ একেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা একেকরকম। কারও হয়তো বিশেষ ধরনের শারীরিক সমস্যা আছে। একেকজনের ক্ষমতাও আলাদা। এগুলো বিচারের মধ্যে না রেখে কোনভাবেই আসন অনুশীলন করানো যাবে না। এটা মনে না রেখে আসন করালে গুরুতর দৈহিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। এমন কিছু আসন আছে যা এসব দিক বিবেচনা না করেই করানো হয়।

যোগা শিক্ষকের উচিত আলাদা আলাদাভাবে অনুশীলনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে কার জন্য কোন্ আসন ঠিক হবে সেটা নির্ধারণ করা। তা হলেই যোগাতে ফল আসবে এবং ক্ষতিকর অনুশীলন থেকে কাউকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

যোগার বিস্তারে অতি উৎসাহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না দেয় তাহলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। তার জন্য তখন কিন্তু যোগাকে দায়ী করা যাবে না।

প্রশ্ন: উনিশ শতকে স্বামী বিবেকানন্দ একজন সন্ন্যাসী-দার্শনিক হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি হিন্দু পুনর্জাগরণে এক নতুন গতিবেগ সৃষ্টি করেন। আর এস এস পরিচালিত হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এবং আর এস এস নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য সংগঠন স্বামীজিকে একজন নেতৃস্থানীয় জঙ্গি হিন্দুত্ববাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আজও তা অব্যাহত। তাহলে সি পি আই (এম) ও বামপন্থীরা তাঁর মতাদর্শের বিরোধিতায় ব্যাপক কোনও উদ্যোগ নেয়নি কেন?

উত্তর: মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর ভূমিকা সমকালীন চিন্তাধারায় গভীর ছাপ ফেলেছে, সেই ব্যক্তিত্বের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ কিছু মৌলিক আদর্শগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে করতে হয়। কোন্ পরিবেশ ও সময়ে তাঁর জন্ম-কর্ম, তার সমসাময়িক প্রেক্ষিত এ কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং এই সমসাময়িকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আজকের বাস্তবতার নিরিখে, বিশেষ করে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা যখন দাবি করছে স্বামীজি হচ্ছেন তাদের মতাদর্শগত পূর্বপুরুষ, এর উপর দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গেলে ভুল করা হবে।

স্বামীজির চিকাগো ধর্মীয় সম্মেলনে বক্তৃতার শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে বিশ্বহিন্দু পরিষদ যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের চেষ্টা হচ্ছে তাকে সামনে তুলে ধরা। এটা বুঝতে কারও অসুবিধে হয় না যে তারা এভাবে

স্বামীজিকে একজন দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী আখ্যা দিয়ে স্বামীজি তাদেরই লোক বলে চালাতে চেয়েছে।

অবশ্য, স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও জীবনের শুরু থেকে চরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণের শিষ্য হয়ে তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ তিনি রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বিবেকানন্দ ওই মঠের কিছু বিশেষ চিন্তাধারা প্রচারে রাজি হয়নি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলায় বিবেকানন্দের উত্থান ঘটেছিল। সেই সময়ে বাংলা একটি সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক মন্থনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। বাংলায় তখন সবক্ষেত্রে এক কর্মচাঞ্চল্য ও সংস্কারমূলক কর্মযজ্ঞ চলছিল। তখনকার বাংলার সামাজিক অবস্থাকে এভাবেই বর্ণনা করা যায়। তার ফলে সমকালীন মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক নিরাপত্তাহীনতার সংকট দেখা দেয় তার মধ্য থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ সটান উঠে আসেন। এভাবেই তাঁর ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে।

বিবেকানন্দের ভূমিকায় পরম আবেগ ও অনুভূতির মধ্যে অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য যেমন পরিলক্ষিত হয়েছে, তেমনি কখনও কখনও আপাত বৈপরীত্যও লক্ষ্য করা গেছে। একদিকে তাঁর কর্মকাণ্ডের সচেতন অভিমুখ ছিল হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক (অবশ্য তা ছিল কেবল নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত), অন্যদিকে, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, হিন্দু প্রতিক্রিয়াবাদী প্রচারের মর্মবস্তুকে তিনি নির্দ্বিধায় বাতিল করেছেন। তাঁর সমান অপছন্দ ছিল বাবুদের পরিচালিত সংস্কার প্রক্রিয়াও। স্বামীজির জাতীয় নবজাগরণের উদ্যোগ সে সময়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটাই তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে সমকালীন ও পরবর্তীকালের ভুল মূল্যায়নের অনেক সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে।

স্বামীজির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ ভ্রমণই মূলত বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মের প্রতি লড়াকু অনুরাগের ভাবমূর্তি তৈরিতে প্ররোচনা যুগিয়েছে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে তিনি কিন্তু হিন্দু ধর্ম প্রচারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে যাননি। মেরি হেইলকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, "আসলে নীরবে কিছু তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই আমি বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলাম। কিন্তু এসেই ফাঁদে পড়ে গেলাম। এখন আমি আর শান্তিতে থাকতে পারব না।"

বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে যে সংঘাত চলছিল, তাতে তিনি আবেগ তাড়িত হয়ে

বললেন, "আমার গুরু বলতেন, হিন্দু, খ্রিস্টান ইত্যাদি একই সত্যের আলাদা আলাদা নাম। এগুলো মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতিবন্ধক। প্রথমেই এগুলোকে ভাঙার চেষ্টা আমাদের করতে হবে.... এমনকি আমাদের মধ্যে যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁরাও এই অশুভ শক্তির প্রভাবে দানবের মতো কথা বলেন। এখন এসবের অবসানে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং এ কাজে আমরা নিশ্চিতভাবেই জয়ী হবো।"

সমকালীন হিন্দু প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। বিবেকানন্দ অব্রাহ্মণ বংশজাত হয়েও তিনি মঠের আদেশনামা জারির অধিকার ভোগ করছেন, অথচ খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত ধর্মীয় রীতিনীতি তিনি অগ্রাহ্য করছেন— এ ধরনের সমালোচনাকে তিনি আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেন। তিনি বলেন—

"কবে আমি পৌরাণিকপন্থী গোঁড়া হিন্দু ছিলাম? আমি আমাদের ধর্মশাস্ত্রগুলো ভালোভাবে পড়েছি এবং জেনেছি যে আধ্যাত্মিকতা কিংবা ধর্ম শূদ্রদের জন্য নয়। যদি আমি খাদ্যাভ্যাসে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতাম তাতেও কোনও লাভ হতো না। এসব একেবারেই পণ্ডশ্রম। আমি একজন শূদ্র, ম্লেচ্ছ— আমি কেন এসব ধর্মীয় অনুশাসন নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব?"

একইভাবে হিন্দু ধর্মীয় জনপ্রিয় আচরণাদি অনুষ্ঠানকে তিনি তিরস্কার করেন। বলেন, "পুজোর জন্য আজ বাজানো হচ্ছে ঘণ্টা, কাল যোগ হবে ভেরি এবং তার পরদিন চমরি গাইয়ের (ইয়াক টেইলস) গগনভেদি চিৎকার উঠবে.........দু'হাজার বছরের বিচ্ছিন্ন কল্পকাহিনি দিয়ে মানুষকে আনন্দ দান করা .... চক্র, গদা, পদ্ম, শঙ্খ ইত্যাদি ইত্যাদি— ঘণ্টা বাজাতে হবে ডান অথবা বাম দিকে, চন্দনের ফোঁটা কপালে দেবে না শরীরের অন্য অংশে দেবে, এসব চিন্তায় মগ্ন থেকে যাদের দিন-রাত কাটে তারা প্রকৃত অর্থেই হতভাগ্য। আমরা পৃথিবীর হতভাগ্যরা এসব চিন্তা নিয়েই ঘুরছি, কারণ এতোটুকুই আমাদের বুদ্ধির দৌড়।"

তিনি লিখলেন, "কাশী ও বৃন্দাবনে মন্দিরের দরজা খোলা ও বন্ধ করার জন্য কোটি টাকা খরচ করা হয়। এখন দেবতার বেশভূষা পরিবর্তিত হচ্ছে। দেবতার খানাপিনায়ও নতুনত্ব আসছে। আটকুড়ের বেটারা (গর্ভধারণে অক্ষম মায়ের সন্তান) পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করছে। সব সময়ই দেখছি জীবন্ত ভগবান খাদ্য ও শিক্ষার অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বম্বের ব্যবসায়ীরা ছাড়পোকাদের জন্য হাসপাতাল বানায়। অযত্নে কেউ মারা গেলে তাতে যেন কারও কিছু যায় আসে না। আমাদের দেশকে এক ভয়ঙ্কর অসুস্থতা গ্রাস করেছে। গোটা দেশটা এক বিরাট পাগলা গারদে পরিণত হয়েছে।"

বেশকিছু সামাজিক কুপ্রথা সম্পর্কেও তিনি একইভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বললেন, "শিশু বিবাহ প্রথাকে আমি তীব্রভাবে ঘৃণা করি। এরজন্য মানুষ পয়সা কড়ি খরচ করে। এতো এক ধরনের ভয়ঙ্কর পাপ, যার কোনও ক্ষমা হতে পারে না। এই দানবীয় প্রথাকে আমি যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করি তাহলে আমি নিজের বিবেকের কাছে দায়ী থাকব। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই কুপ্রথার বুকে আমাকে পদাঘাত হানতেই হবে।"

উপসংহারে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আধ্যাত্মবাদী। কিন্তু, হিন্দুত্বের মাস্তুলশীর্ষ থেকে তাঁর অবস্থান ছিল বহুযোজন দূরে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সংগ্রাম ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার অভিমুখে সংস্কার আন্দোলনের এক উত্তাল তরঙ্গ। কিন্তু, রামকৃষ্ণের (তাঁর গুরু) ধর্মবিশ্বাসের হুজুগে জনপ্রিয়তা উনিশ শতকের বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রতিরূপ, যা ভক্তি আন্দোলনের উত্থানে এক ব্যাপক উদ্দীপনা যুগিয়েছে। এই ভক্তি আন্দোলন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙালির সমাজ জীবনকে তোলপাড় করেছে।

সুতরাং, এটা খুবই পরিষ্কার যে, আমরা যখন তাঁর দার্শনিক আধ্যাত্মবাদের সমালোচনা করব, তেমনি একইসঙ্গে তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে এমন বহু উপাদান রয়েছে, যা আজকের দিনে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও উগ্রজাত্যভিমানীদের হাতে ধর্মীয় বিকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রশ্ন: কিছু সংখ্যক সমাজকর্মী ও বুদ্ধিজীবী সি পি আই (এম) -কে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছেন আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বি জে পি'র বিরুদ্ধে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঐক্য গড়ে তুলতে পার্টি যেন পদক্ষেপ নেয়। বি জে পি বিরোধী ভোটের বিভাজন রুখতে ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রার্থী না দিতেও এই আবেদনে অনুরোধ করা হয়েছে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে পার্টির অবস্থান কী?

উত্তর: উত্তরপ্রদেশ দেশের বৃহত্তম রাজ্য। স্বভাবতই এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য বি জে পি সমস্ত শক্তি নিয়ে কাজ করছে।

উত্তরপ্রদেশে বি জে পি বিজয়ী হলে সারা দেশে বি জে পি-র শক্তি আরও বাড়বে বলে বি জে পি নেতৃত্ব মনে করছেন এবং সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি রূপায়ণে হিন্দুত্ববাদী

শক্তিগুলি তাতে আরও চাঙ্গা হবে।

পত্রলেখকদের আবেদন যতই আন্তরিক ও সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হোক না কেন, এই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার কিন্তু মিল নেই। এই যে বি জে পি বিরোধী সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তির মোর্চা গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তা করতে গেলে তো দুটো আঞ্চলিক দল সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টিকে প্রথমে এক জায়গায় আসতে হবে। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং তাদের সামাজিক ও সম্প্রদায়গত সমর্থনের ভিত্তির বিভিন্নতা থেকে এটা বলা যায় এদেরকে একজোট করা দুরূহ ব্যাপার। এ যেন তামিলনাড়ুতে ডি এম কে এবং এ ডি এম কে-কে একসঙ্গে করে নির্বাচনী যুদ্ধ করার মতো অসাধ্য কাজ। তাছাড়া সমাজবাদী পার্টি এবং জে ডি (ইউ)'র মতো দলগুলিকে একসঙ্গে করে বিহারের মতো নির্বাচনী জোট গড়াও বাস্তবসম্মত নয়। কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশে এখন আরও ছোট একটি দলে পরিণত হয়েছে। এখন বলুন তো, এইসব শক্তিগুলিকে একজোট করে উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন করা কতটুকু বাস্তবসম্মত? একেবারেই বাস্তবসম্মত নয়।

বাম দলগুলির কথা যদি বলি, উত্তরপ্রদেশে আমাদের শক্তি কম হলেও আমরা একসঙ্গে মিলে নির্বাচনী লড়াই চালাতে পারি এবং চালাবোও। বামেরা ছাড়া অন্য কোনও গণতান্ত্রিক শক্তি, যারা বামেদের সঙ্গে মিলে নির্বাচনী যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত, তাদেরকে সঙ্গে নিতে বামপন্থীদের কোনও আপত্তি নেই।

বি জে পি-কে হারাতে বামেদের স্বাধীন নির্বাচনী প্রচার একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে একমাত্র বামেরাই নিরবচ্ছিন্ন ধারায় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত লড়াই চালিয়ে আসছে। বি জে পি'কে বিচ্ছিন্ন ও পরাজিত করতে জনগণের সামগ্রিক ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই কাজ সহায়ক হবে।

প্রশ্ন: সংবাদ মাধ্যমের খবরে প্রকাশ যে ভেনেজুয়েলায় অনুষ্ঠেয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন না, অন্য কোনও একজন মন্ত্রী হয়তো ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। এই ঘটনা ভারতের বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে কী তাৎপর্য বহন করছে? সি পি আই (এম) তাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করছে?

উত্তর: এ বছরের ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর নির্জোট আন্দোলনভুক্ত দেশগুলির এক সম্মেলন ভেনেজুয়েলায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার বিদেশমন্ত্রী ডেলসি রডরিগজ দিল্লিতে এসে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের নিকট লিখিত

আমন্ত্রণপত্র দিয়ে গেছেন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক সূত্র প্রচার মাধ্যমকে জানিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত এই সম্মেনে অংশ নিচ্ছেন না।

যদি এটা সত্যি হয় তাহলে এই প্রথম একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্জোট সম্মেলনে গড়হাজির থাকার নজির সৃষ্টি হবে। এর আগে ১৯৭৯ সালে চরণ সিং যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখনই কেবল এই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। অবশ্য, তার পেছনে কারণও ছিল। চরণ সিং -র সরকার ছিল স্বল্পস্থায়ী এবং তখন তিনি ছিলেন কেয়ার- টেকার প্রধানমন্ত্রী।

এই নির্জোট সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদির অনুপস্থিতি এটাই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে ভারত সরকারের নিকট নির্জোট সম্মেলন আজ প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব দুটোই হারিয়েছে। নির্জোট সম্মেলনে ভারত যে দীর্ঘকালব্যাপী সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতো, মোদির অনুপস্থিতি তাকে বিপরীত অভিমুখ দেবে। তাছাড়া ভারত নির্জোট সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও বটে।

মোদি সরকার অনুসৃত বিদেশ নীতি ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত অবস্থানকে ধূলিস্যাৎ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ গাঁটছড়া বেঁধেছে। গত দু'বছরে মোদি সরকার দশ বছর মেয়াদি প্রতিরক্ষা কাঠামো চুক্তির নবীকরণ করেছে। অধিকন্তু মার্কিন সেনাবাহিনীকে ভারতীয় সেনা ঘাঁটিগুলি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে 'লজিস্টিক সাপোর্ট' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এশীয় - প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ও ভারত মহাসাগর এলাকায় মোদি সরকার প্রেসিডেন্ট ওবামার সঙ্গে ' জয়েন্ট ভিশন' চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভেনেজুয়েলার সরকার সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়ে আসছে। মার্কিন সরকার প্রকাশ্যেই ভেনেজুয়েলার প্রতি শত্রুতামূলক কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছে। সেই ভেনেজুয়েলায় অনুষ্ঠেয় নির্জোট সম্মেলনে অনুপস্থিত থেকে মোদি সাহেব আমেরিকাকে তুষ্ট করতে চাইছেন। অথচ ফিলিপাইনসের মতো কিছু দেশ যারা কিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ বলে স্বীকৃত, তারাও এই নির্জোট সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে বলে জানা গেছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি, বি জে পি-র বরাবরের নির্জোট আন্দোলন বিরোধী অবস্থান ও মার্কিন পক্ষভুক্ত লাইন অনুসরণ করে এভাবে প্রকাশ্যে বার্তা দিতে চান যে, ভারত এখন 'নির্জোট নয়', ভারত এখন 'জোটভুক্ত' একটি দেশ।

প্রশ্ন:- এ বছরের অক্টোবর মাসে গোয়ায় ৮ম ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ব্রিক্সভুক্ত দেশগুলির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে

ব্রিক্স-র ভূমিকাকে সি পি আই এম কীভাবে দেখছে?

উত্তর:- ১৫-১৬ অক্টোবর ৮ম ব্রিক্স সম্মেলন গোয়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৫ টি উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে ব্রিক্স গঠিত হয়েছিল। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ এই দেশগুলিতে রয়েছে। বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জি ডি পি) ১৪ শতাংশেরও বেশি হয় এই দেশগুলিতে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। ব্রিক্স হচ্ছে দক্ষিণের এই ধারারই একটা অভিব্যক্তি, যেখানে দক্ষিণের এই পাঁচটি দেশ একজোট হয়ে রাষ্ট্রসংঘের সংস্কার, বিশ্ব বাণিজ্য, আবহাওয়ার পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে আন্তর্জাতিক নানা ফোরামে উন্নয়নশীল দেশগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে আসছে। আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বিধানে ব্রিক্স অন্যদের সঙ্গে মিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এই সম্ভাবনাময় ভূমিকার যথার্থ লালন ও তাকে বিকশিত করে একমেরু বিশ্ব গঠন ও একাধিপত্যের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে যুক্তিগ্রাহ্য পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে গণচাপের ফলস্বরূপ ব্রিক্স তার বিগত দুটো সম্মেলনে সিরিয়ায় একতরফা মার্কিনি সামরিক হস্তক্ষেপের স্পষ্ট বিরোধিতা করেছে এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে সিরিয়া-সংকটের সমাধানকল্পে সিরিয়ার রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ তৈরির আহ্বান জানিয়েছে। ইরাকের জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতিও ব্রিক্স সমর্থন জানিয়েছে এবং দেশটাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে ভাগ করার জন্য মার্কিনি উদ্যোগের প্রতিবাদ জানিয়েছে। একইভাবে, পশ্চিম এশিয়ায় ফিলিস্তিনী ভূখণ্ড জবরদখল করে রাখার ইজরায়েলি ভূমিকার নিন্দা করেছে এবং স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ১৯৬৭ সালের আগের অবস্থায় ইজরায়েলকে ফিরে যেতে হবে এবং পূর্ব জেরুজালেম প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের রাজধানী হবে। আমেরিকা যেভাবে বৈদ্যুতিন জগতে বিশ্বের সমস্ত নাগরিকদের তথ্য করায়ত্ত করছে, ব্রিক্স তার বিরোধিতা ঘোষণা করেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিক্স ব্যাংক নামের একটি নতুন উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে, যার মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ সহজলভ্য হবে এবং ব্রিক্স ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে আর্থিক যোগান নিশ্চিত করা যাবে। এর ফলে ধারাবাহিক উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হবে। এই ব্যাংক গঠনের মাধ্যমে ব্রিক্সভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে এবং আই এম এফ ও বিশ্বব্যাংকের মতো

দানবীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নির্ভরশীলতা কমানো সম্ভব হবে। এই ব্যাংক ইতোমধ্যে স্থাপিত হয়েছে সাংহাই-এ, যার নেতৃত্বে রয়েছে ভারত। আশা করা যাচ্ছে আসন্ন গোয়া সম্মেলনে ব্যাংকটির উদ্বোধনী বিনিয়োগ প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হবে। বিশ্ব আর্থিক নিরাপত্তায় অবদান রাখতে ব্যাংক একটি আপৎকালীন সংরক্ষিত ব্যবস্থার সংস্থান রাখারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে ব্রিক্‌সভুক্ত দেশগুলির মধ্যে মৌলিক বিভিন্নতা রয়েছে। চীন যেমন সমাজতান্ত্রিক দেশ, অন্যগুলি কিন্তু পুঁজিবাদী দেশ। এগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সরকারও রয়েছে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফকে সংসদ সরিয়ে দিয়েছে। ভারতে রয়েছে দক্ষিণপন্থী বি জে পি সরকার। এই ধরনের বিভিন্নতা ব্রিক্‌সের আগামীদিনের পথচলাকে প্রভাবিত করতে বাধ্য।

দিলমা রুসেফের ইমপিচমেন্টের পর ব্রাজিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রেমার প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়েছেন। তার চেষ্টা থাকবে আমেরিকার সঙ্গে ব্রাজিলের তিক্ত সম্পর্কের অবসান ঘটানো। ট্রেমারের প্রশাসন ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা ব্রাজিলকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল আঞ্চলিক বিভিন্ন জোট থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে আনবে।

ভারতে আমরা ইতোমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি যে বি জে পি সরকার আমেরিকার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে এবং জোট নিরপেক্ষ নীতি থেকে সরে এসেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত যে 'লেমোয়া' (লজিস্টিক এক্সচেঞ্জ মেমোরেন্ডাম অব এগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষর করেছে এবং ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদির অনুপস্থিতি ভারত সরকারের চিরাচরিত বিদেশ নীতি থেকে সরে আসার সাম্প্রতিকতম দুটো উদাহরণ।

বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এসব পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ নীতিতে প্রতিফলিত হবে এবং আসন্ন গোয়া সম্মেলনে নিশ্চিতভাবেই এর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। এর থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জনগণের সতর্ক দৃষ্টি ও গণসংগ্রাম, যার লক্ষ্য হবে এসব নীতি পরিবর্তনের ফলে জনগণের স্বার্থ যেন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে উৎসর্গ করতে না হয়। একমাত্র এর মাধ্যমেই ব্রিক্‌সের বহুমেরু বিশ্বের লক্ষ্য অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে ব্রিক্‌স সক্ষম হতে পারে।

প্রশ্ন: এবারের স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বালুচ জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছেন। তারপর থেকে মোদি সরকার পাকিস্তানের বালুচ জনগণের স্বার্থকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে সি পি আই (এম)'র অভিমত কি?

উত্তর : বালুচিস্তান পাকিস্তানের একটি সম্পদশালী প্রদেশ, যার সঙ্গে রয়েছে ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত। বিগত কয়েক দশক ধরে উগ্রবাদী কার্যকলাপ চলেছে। বালুচিস্তানের বিশেষ মর্যাদার দাবি ছাড়াও এদের কিছু অংশ স্বাধীন বালুচিস্তানের দাবিতে এই হিংসাত্মক তৎপরতা জারি রেখেছে।

বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানি সেনারা এ ধরনের বিদ্রোহী তাৎপরতা দমন করেছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন সরকার বালুচ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কড়া হাতে দমন করার নীতি গ্রহণ করে আসছে, যার ফলস্বরূপ মানবাধিকার লঙ্ঘনেরও বহু ঘটনা সেখানে ঘটেছে। আফগানিস্তানে দীর্ঘমেয়াদি হিংসা ও সংঘাত চলতে থাকায় বহুসংখ্যক আফগান শরণার্থী পকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে। পরিণামে ওই রাজ্যের জনসংখ্যাগত তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। জেহাদি সন্ত্রাসীরা এই প্রদেশকে ব্যবহার করে তাদের হিংসাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছে। সেনারা এইসব জঙ্গীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপারেশন চালাচ্ছে। পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করতে হয় যে তালিবান সুরা, আগে যার নেতা ছিলেন মোল্লা ওমর, সেই গোষ্ঠীর প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে বালুচ রাজধানী কোয়েটা-য়। এটা বলা বাহুল্য যে পাকিস্তানি শাসকদের অনুগ্রহে তালিবান সুরা নামের জঙ্গীগোষ্ঠী বালুচিস্তানে থাকতে সক্ষম হচ্ছে।

মোদি তার ভাষণে যা বললেন তাতে এ প্রশ্ন এসে যায়, ভারত কি বালুচিস্তান, পাকিস্তানের অঙ্গ কিনা, এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে? অতীতে ভারতের কোনও সরকারই এ নিয়ে কখনও সংশয় প্রকাশ কিংবা প্রশ্ন তোলেনি। পাকিস্তান থেকে আলাদা সত্তা বিশিষ্ট বালুচিস্তানের প্রতি আজও আন্তর্জাতিক সমর্থন মিলেনি।

পাকিস্তানি নেতৃত্ব তাদের স্বাধীনতা দিবস (১৪ আগস্ট) উদ্‌যাপনের সময় কাশ্মীরকে কেন্দ্রীয় ইশ্যু করেছেন। তারই জবাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বালুচিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনলেন এবং বালুচ জনগণের প্রতি সংহতি জানালেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি-র এই 'ইটের বদলে পাটকেল মারা'- র নীতি অদূরদর্শী এবং উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের বিপরীত পরিনামবহতা ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতার চতুরভাবে কাশ্মীরের গণঅসন্তোষের উল্লেখই করলেন না। ইতোমধ্যে কাশ্মীরি জনগণের

আন্দোলনের ওপর বর্বর পুলিশি অভিযান বহু তাজা প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে এবং অনেক ছেলে-মেয়েকে চিরতরে অন্ধ করে দিয়েছে। ঠিক এ সময়ে বালুচিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন বিচক্ষণতার দাবি করে না।

প্রথমত, কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় -ভারত সরকারের এই অবস্থানকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য খাটো করেছে। বালুচ ইশ্যু উত্থাপন করে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পাকিস্তানের নাক গলানোর অজুহাত খাড়া করতে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বি জে পি - আর এস এস জোট বালুচিস্তানের স্বাধীনতার দাবির পক্ষে সওয়াল করছে। দেশের বাইরে থাকা বিচ্ছিন্নতাবাদী বালুচ নেতাদের আর এস এস আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং তাদের দাবি সামনে তুলে ধরছে।

তৃতীয়ত, বালুচ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দাবির প্রতি কোনওরূপ সমর্থন পাকিস্তানের প্রতিবেশী ইরান ও আফগানিস্তানের দিক থেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে। কারণ, এই দেশগুলিও সীমান্তের ওপারে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের হিংসাত্মক তৎপরতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সি পি আই (এম) বালুচিস্তানে দমনপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা করছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকেই বালুচ জনগণের জাতীয় সমস্যার একটি গণতান্ত্রিক সমাধান খুঁজতে হবে। এই আহ্বান জানাতে গিয়ে পার্টি বালুচ ইশ্যুতে মোদি সরকারের সুবিধাবাদী ও উসকানিমূলক কৌশলের বিরোধিতা করছে।

প্রশ্ন : ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৯৮ শতাংশই আন্তর্জাতিক সীমানায় ঘেরা। ফলে অঞ্চলটি দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় সংযোগহীন বলা চলে। তেমনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেও পারস্পরিক সংযোগহীনতা লক্ষ্য করা যায়। অঞ্চলের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্য ও পাহাড়ি দুর্গমতার কারণে খাদ্যাভ্যাস, জনজাতিগত এবং ভাষা, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে যার-যার মতো করে বিকশিত হয়েছে। সুতরাং এইসব রাজ্যের জনগণ সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সুনির্দিষ্ট পরিচিতি বহন করে চলেছে। এর একটা ইতিবাচক দিক হচ্ছে এদের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রাধান্য রয়েছে। নেতিবাচক দিক হচ্ছে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া একের

পর এক আসা কেন্দ্রীয় সরকারগুলির উদাসীনতা ও অবহেলার ফলে এই অঞ্চলটি প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদকামী শক্তিগুলির উর্বর বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ত্রিপুরার পরিস্থিতি ভিন্ন। কারণ ১৯৪৫ সালের জনশিক্ষা আন্দোলনের সময় থেকে এ রাজ্যে একটা গণতান্ত্রিক ভাবধারার উন্মেষ ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা ছাড়া পূর্বোত্তরের অন্যান্য রাজ্যে সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে সি পি আই (এম) কী ধরনের বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারে?

উত্তর ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জনগণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব সম্পর্কে আপনার বক্তব্য সঠিক। সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেমন রয়েছে, তেমনি এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির জনগণের ও জনজাতিগত বিকাশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্নতা রয়েছে।

উপজাতীয় ও নৃকুলগত এই অনন্যতা ও বৈচিত্র্য এই অঞ্চলে সি পি আই (এম) ও বাম আন্দোলনের বিকাশে বিশেষ ধরনের প্রতিকূলতা তৈরি করেছে। এখনকার আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুর— এই তিনটি মাত্র রাজ্যে স্বাধীনতার আগে থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংযোগ ছিল। সে কারণেই ত্রিপুরা ছাড়া আসামেই সি পি আই (এম) ও বাম আন্দোলনের বিকাশের অধিকতর সুযোগ ছিল। ত্রিপুরায় স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট পার্টির শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

অবশ্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতির বিকাশ এমনভাবেই ঘটেছে যেখানে উপজাতীয় ও নৃকুলগত পরিচিতি সত্তা প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারগুলির বৈষম্য ও অবহেলার পাশাপাশি এই অঞ্চলের জনগণের ক্ষোভ ও বিচ্ছিন্নতাবোধকে জনগোষ্ঠীগত ও উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে সন্ত্রাসবাদী ও বিভেদকামী শক্তিগুলি কাজে লাগিয়েছে।

এই অবস্থা আসামকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মণিপুরকে তো করেছেই। সেখানকার উপজাতি ও অ-উপজাতি গোষ্ঠীগুলি নিজ নিজ সশস্ত্র শাখা তৈরি করে জোর করে অর্থ আদায় করছে এবং সরকারি প্রশাসনের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের মতো রাজ্যে বিদ্যমান ধর্মভিত্তিক সাংস্কৃতিক আধিপত্য কমিউনিস্ট মতাদর্শ বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করেছে।

আসাম ছাড়া পূর্বোত্তরের অধিকাংশ রাজ্যে সে ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ ঘটেনি। তা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশে বিপত্তি ঘটাচ্ছে।

এইসব সমস্যা ও বিশেষত্বগুলি মনে রেখেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বামপন্থী আন্দোলন গড়ার প্রশ্নটিকে বিবেচনা করতে হবে।

পূর্বোত্তরে বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশ নির্ভর করছে আসামে পার্টি ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার উপর। এটা করতে পারলে এই অঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেও তার প্রভাব পড়বে। মণিপুরে পার্টি ও গণআন্দোলনের বিকাশের ওপর সবিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল। অন্যান্য রাজ্যে গণসংগঠন ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্যই চেষ্টা চালাতে হবে। তার উপরই নির্ভর করবে বাম আন্দোলনের বিকাশ।

প্রশ্ন: আধার কার্ড নিয়ে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। মোদি সরকার সব ক্ষেত্রে এই কার্ডের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সম্পর্কে সি পি আই (এম)-র মতামত জানতে চাই।

উত্তর: সি পি আই (এম)'র স্পষ্ট অবস্থান হচ্ছে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা চলবে না। এই কার্ড বাধ্যতামূলক করা হলে সরকারি নানা প্রকল্প ও কর্মসূচি থেকে কোটি কোটি মানুষ বাদ পড়বেন। মোদি সরকার স্বচ্ছতার নামে, দুর্নীতির অবসানের কথা বলে আধার কার্ডের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে গরিব জনগণের বড় অংশকে সরকারি কল্যাণকর প্রকল্পের বাইরে রাখার জন্যই। এটাই সি পি আই (এম)-র পরিষ্কার বক্তব্য।

আমাদের পার্টির এই বক্তব্য বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আধার কার্ড না থাকার জন্য গরিবদের নানা প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত সরকারি হিসাব অনুযায়ী যত আধার কার্ড ইশ্যু করা হয়েছে। তা দেশের মোট জনসংখ্যার একটা ছোট অংশকে কভার করেছে মাত্র। যদি প্রাপ্তবয়স্কদের কথা ধরা যায় তা হলে ৬০ শতাংশেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের এখনও আধার কার্ড নেই। ‘ভুয়ো কার্ড’ অনুসন্ধানের নামে সরকার প্রায়শই ডাইনি খোঁজার উদ্যোগ নেয়। তাতে আরও বেশ কিছু প্রকৃত সুবিধাপ্রাপক, যাদের অধিকাংশই গরিব ও পরিযায়ী শ্রমিক, যাদের কাছে সরকারি কল্যাণকর কর্মসূচিগুলির সুযোগ নেওয়া খুবই জরুরি, এদেরই

তো বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করার এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা হয়। ২০১৫ সালের ১৫ অক্টোবর শীর্ষ আদালত রায় দেয় যে, আধার কার্ড সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছামূলক হবে। কিন্তু এম এন রেগা, সব ধরনের পেনশন প্রকল্প, কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পে আধার কার্ডের ব্যবহার সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এর আগে গত বছরের আগস্ট মাসে শীর্ষ আদালত শুধুমাত্র গণবণ্টন ব্যবস্থা ও রান্নার গ্যাস বণ্টনে আধার কার্ডের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল। শীর্ষ আদালতের এই রায়কে অগ্রাহ্য করে মোদি সরকার এখন সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নিয়েছে। এটা শীর্ষ আদালতকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করার শামিল। এখন দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউ জি সি) সব ধরনের সরকারি ভরতুকি, স্কলারশিপ, ফেলোশিপ সব ক্ষেত্রেই ২০১৬-১৭ (চলতি) অর্থ বছর থেকে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটগুলির উপাচার্যদের নিকট লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছে।

এ থেকে এটা পরিষ্কার যে গরিব ও বেঁচে থাকার জন্য যাদের সরকারি সহায়তা প্রয়োজন তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্যই সরকার এ ধরনের জনস্বার্থ বিরোধী উদ্যোগ নিয়েছে। এ কারণে সি পি আই (এম) সরকারের এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে। অবশ্য এই বিরোধিতার পেছনে অন্য কিছু কারণও রয়েছে।

আজকের দুনিয়ায় ব্যক্তি- নাগরিকদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলি ও কর্পোরেটদের মধ্যে শেয়ার করার কাজটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব তথ্যের মাধ্যমে তারা নাগরিকদের ওপর নজরদারি চালায় ও বাজারের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে এটা এক ভয়ঙ্কর বিপদ। কারণ, আধার-র পরিকাঠামো ও তার সংরক্ষণ-ভার বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলির ওপর ন্যস্ত রয়েছে, যারা মার্কিনি প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলে। এইসব বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তির বিস্তৃত তথ্য সরকার জনসমক্ষে আনতে রাজি নয়। ফলে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার মৌলিক নীতিমালা লঙ্ঘনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করতে হবে।

সবশেষে, বিভিন্ন সময়ে এটা দেখা গেছে যে আধার কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের বায়োমেট্রিক পরিচিতি পদ্ধতি অনুসৃত হয় তা কিন্তু সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়, পুরোপুরি

বিশ্বাসযোগ্যও নয়। চোখের কোনও সমস্যা থাকলে পরিচিতি-তে এমন ধরনের পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে যেখানে প্রকৃত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করাটাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাছাড়া কঠোর পরিশ্রমের ফলে আঙুলের ছাপেও পরিবর্তন আসে।

এসব কারণে সি পি আই (এম) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, আধার কার্ডের বাধ্যতামূলক ব্যবহার প্রকৃত গরিবদের সরকারি প্রকল্প থেকে দূরে রাখার অভিমুখ নিয়েই বাস্তবায়িত করার চেষ্টা হচ্ছে। এটা ত্রুটিপূর্ণ ও অকার্যকর একটি পদ্ধতি, জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে যা হুমকিস্বরূপ। সুতরাং শীর্ষ আদালতের রায় মেনে সব ক্ষেত্রে আধার কার্ডের বাধ্যতামূলক ব্যবহারের জনবিরোধী পথ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে সরে আসতে বাধ্য করতে হবে।

প্রশ্ন:- কাবেরী নদীর জলবণ্টন নিয়ে তামিলনাড়ুকে জল ছাড়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পর কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু দুটি রাজ্যের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে উঠে। কর্ণাটকে এ নিয়ে হিংসাত্মক প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে। এই বিরোধে সি পি আই (এম) 'র অবস্থান কি?

উত্তর:- কাবেরী নদীর জল বণ্টনের বিষয়টি একটি জটিল সমস্যা যাতে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরী ও কেরালা এই চারটি রাজ্যের স্বার্থ জড়িত। সমস্যাটির একটি ঐতিহাসিক পটভূমিও রয়েছে। নদীটির উচ্চতর অববাহিকায় অবস্থিত বলে এর জলের উপর কর্ণাটকের একক দাবি বা নিম্নতর অববাহিকায় থেকেও ঐতিহাসিকভাবে এই জলের ভোক্তা হিসাবে তামিলনাড়ুর একক দাবি— এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সমস্যা সমাধান হবে না। সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী এই সমস্যায় পক্ষভুক্ত সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের ফলে সমস্যাটির অনেক বাঁক ও মোড় ঘটে গেছে। একসময় কাবেরী জলবণ্টন সমস্যা নিরসনের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ২০০৭ সালে ট্রাইব্যুন্যাল তাদের রায় ঘোষণা করে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সেই রায় কার্যকর করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে। বিজ্ঞপ্তিতে এও বলা হয় যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেই এই রায় আইনত মেনে নিতে হবে। তবে সমস্যা হল, এ বছর কম বৃষ্টিপাতের ফলে জলাধারের জলস্তর নেমে যাওয়ার কারণে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কাবেরী জলবণ্টন বিবাদ তখনই চরমে উঠে, যে বছর স্বল্প বৃষ্টিপাতের ফলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির চাহিদা মেটাতে কাবেরীর জলের যোগানে

সার্বিক ঘাটতি দেখা দেয়। কেরালা ও পণ্ডিচেরী অপেক্ষাকৃত নিম্ন অববাহিকায় অবস্থান করলেও, এই বিবাদে তারাও পক্ষভুক্ত এবং এই নদীর জলের উপর তাদের নিজেদের অংশ রয়েছে বলে দাবি করে। কিন্তু মূলত যে দুটি রাজ্য মুখ্য দাবিদার, সেগুলি হল কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু। অতি বর্ষণের বছরগুলিতে জলের যোগান স্বাভাবিক থাকলে সমস্যাটির তীব্রতা ততটা মাত্রা না পেলেও মূল সমস্যা হল খরার বছরগুলিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে জলবণ্টনের জন্য গ্রহণযোগ্য সমবণ্টন সূত্র বের করা।

যদিও ট্রাইব্যুনালের রায়ে খরার সময় জলবণ্টন ব্যবস্থায় একটি উদার নীতি নির্দেশিকার উল্লেখ রয়েছে, একটি কার্যকরী নমনীয় জল বণ্টন সূত্র বের করতে হবে দুটি মুখ্য দাবিদার রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই।

সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বের মূল কারণই হল কাবেরী অববাহিকা অঞ্চলে স্বল্প বৃষ্টিপাত। সুপ্রিম কোর্ট ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তামিলনাড়ুকে প্রতিদিন ১৫,০০০ কিউসেক জল ছাড়ার জন্য কর্ণাটককে নির্দেশ দেয়। কর্ণাটক এই রায়ে অসন্তুষ্ট হয়েও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করে। পরবর্তী সময়ে কর্ণাটক সরকারের একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনে সাড়া দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তামিলনাড়ুর জন্য বরাদ্দ জল দৈনিক ১২,০০০ কিউসেক করার নির্দেশ দেয় এবং অপরদিকে এই বরাদ্দের সময়সীমা ৫ দিন বাড়িয়ে দেয়। এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুসহ বিভিন্ন স্থানে তামিলনাড়ু থেকে আগত বাস ও অন্যান্য যানবাহনে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে এবং মোটর শ্রমিকদের উপর হিংসাত্মক আক্রমণ সংঘটিত হয়। কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। কিন্তু এই বিবাদের একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য, দুটি রাজ্যের কৃষক ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই দুটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের আলোচনায় বসে একটি গ্রহণযোগ্য চুক্তিতে উপনীত হতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই প্রক্রিয়ায় সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, সাধারণভাবে বুর্জোয়া দলগুলি দুটি রাজ্যের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সমবণ্টন নীতি অনুসরণ করে, একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হওয়ার নীতি গ্রহণ করে না। শ্রমিকশ্রেণীর দল হিসাবে সি পি আই (এম) মনে করে কাবেরী জলের দাবিদার সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে:-

ক) এই সমস্যা সমাধানে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া মেনে চলতে হবে।

খ) সমবণ্টন নীতি অনুসরণে, আলোচনার মাধ্যমে সব পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক লাভালাভের বিচার করে, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উত্তেজনায়

ইন্ধন দিয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য বিভেদকামী শক্তি কার্যত সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির শ্রমজীবী জনগণকেই বিভাজিত করছে। এবং এর মাধ্যমে এরা সমস্যাটির স্থায়ী সমাধানে উপনীত হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করছে। এদের এই ভূমিকা দেশ, সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহ এবং শ্রমজীবী জনগণের সামনে সমূহ বিপদ।

প্রশ্ন: সে-ই কবে ২০১৪ সাল থেকে প্রতিবন্ধী অধিকার বিলটি রাজ্যসভায় পড়ে আছে। এ সম্পর্কে পার্টির অবস্থান জানতে আগ্রহী।

উত্তর: ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিলটি পেশ করা হয়েছিলো। দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার তখন চলে যাওয়ার মুখে। ১৯৯৫ সালের আইনের বদলে নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয় যখন ২০০৭ সালে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের সনদে ভারত স্বাক্ষর করে এবং অনুমোদন দেয়। সেই দিক থেকে দেখলে বিলটি সংসদে উপস্থাপন করতে এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো।

বিলে ১৯ রকমের প্রতিবন্ধা চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরানো আইনে ছিল ৭ রকমের। প্রতিবন্ধীদের চাকরিতে সংরক্ষণ তিন শতাংশের বদলে পাঁচ শতাংশ করার সংস্থান রাখা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের আইনের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা ছিল, প্রতিবন্ধীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের জন্য কোনওরূপ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না। নতুন বিলে প্রতিবন্ধী অধিকার আইনের কোনও ধারা লঙ্ঘিত হলে দোষীদের ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা দশ হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা সংযোজিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সাজার মাত্রা আরও বাড়ানো হয়েছে।

বিলের একটি বিশেষ ধারা নিয়ে সি পি আই (এম) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। ওই ধারায় বলা হয়েছে " আইনি লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থ ছাড়া" প্রতিবন্ধীদের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না। সি পি আই (এম) তার বিরোধিতা করে বলেছে, যেই বিল প্রণীত হয়েছে প্রতিবন্ধীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, সেখানে প্রতিবন্ধীদের প্রতি বৈষম্যের আইনসিদ্ধ ব্যবস্থা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রেরও পরিবর্তন করা দরকার। সে কারণেই বিলটিকে খতিয়ে দেখার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠাতে পার্টি দাবি জানিয়েছিল। তাতে যাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য বিলটি তৈরি হয়েছে তারাও তাদের মতামত দেওয়ার সুযোগ পাবেন এবং এই সুযোগ তাদের দিতেই হবে। তাছাড়া

এমন সময়ে বিলটি সংসদে উপস্থাপিত হয় যখন অন্য ইশ্যুতে উত্তপ্ত সংসদে এই বিল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ ছিল না। স্থায়ী কমিটি ২০১৫ সালের মে মাসে তার সুপারিশগুলি যথাস্থানে জমা দিয়ে দিয়েছে। সুপারিশের মধ্যে ছিলো " আইনি লক্ষ্যপূরণে" প্রতিবন্ধীদের প্রতি বৈষম্যের বৈধতা দেওয়া চলবে না। প্রস্তাবিত বিল থেকে এই অংশ বাদ দেওয়া হোক। স্থায়ী কমিটি আরও সুপারিশ করেছে যে বেসরকারি ক্ষেত্রকেও এই আইনের আওতায় আনা হোক। স্থায়ী কমিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হলো বি পি এল - এ পি এল নির্বিশেষে প্রতিবন্ধীদের নিখরচায় খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও চিকিৎসা পরিসেবা পাওয়ার আইনি অধিকার সুনিশ্চিত করতে এই বিলে সংস্থান রাখা হোক। প্রতিবন্ধা সম্পর্কিত তথ্যাদি বিদ্যালয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও স্থায়ী কমিটি সুপারিশ করেছে।

অবশ্য আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে স্থায়ী কমিটি কোনও সুপারিশ করেনি। যেমন, চাকরিতে প্রমোশনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, যার পক্ষে শীর্ষ আদালতের রায় রয়েছে, প্রতিবন্ধী আয়োগের সভাপতি পদে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বসানোর দাবি ইত্যাদি সম্পর্কে স্থায়ী কমিটির কোনও সুপারিশ নেই। স্থায়ী কমিটির সুপারিশ দেড় বছর আগে জমা পড়লেও এইসব সুপারিশ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এটা করা সংসদীয় কাজের ধারায় একটি সাধারণ প্রথা। এদিকে প্রধানমন্ত্রী চার মন্ত্রীকে দিয়ে একটি মন্ত্রীগোষ্ঠী গঠন করলেন এবং বললেন যে এই গোষ্ঠী স্থায়ী কমিটির সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখবে। মন্ত্রীগোষ্ঠীর বক্তব্য অবশ্য আজ পর্যন্ত জনসমক্ষে আসেনি।

সি পি আই (এম)'র দাবি হচ্ছে— সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশগুলি সম্পর্কে সরকারের অবস্থান অনতিবিলম্বে স্পষ্ট করতে হবে এবং আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে বিলের সংশোধনীগুলি সংসদে পেশ করতে হবে।

প্রশ্ন: কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন একইসঙ্গে করতে চাইছে। এটা হলে দেশের জন্য তো ভালোই হয়, তাই না? এ সম্পর্কে সি পি আই (এম)'র অবস্থান কী?

উত্তর : বি জে পি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির

নির্বাচন একসঙ্গে অনুষ্ঠিত করতে আগ্রহী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এই প্রস্তাবের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে মোদি সরকার এ বিষয়ে জনগণের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেছে। এই প্রস্তাবের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন যে রয়েছে তার আভাস পাওয়া যায় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির এই প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জানানোর মধ্য দিয়ে। এর আগে সংসদের ব্যক্তিগত মতামত, গণঅভিযোগ, আইন ও বিচার সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি ২০১৫ সালে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিলো। তাতে কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভাগুলির একইসঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দেওয়া হয়েছিলো। একসঙ্গে নির্বাচন করার প্রবক্তাদের যুক্তি হচ্ছে: —

— আলাদা আলাদা নির্বাচন করতে গিয়ে সরকারের প্রচুর অর্থ খরচ হয়। একসঙ্গে নির্বাচন হলে সরকারি অর্থ বাঁচানো যাবে।

— প্রতি বছরই কোনও না কোনও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাতে আদর্শ আচরণ বিধি লাগু হয়। তাতে সরকারি কাজকর্ম মুখ থুবড়ে পড়ে। পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যাঘাত ঘটে। একসঙ্গে নির্বাচন হলে প্রশাসনিক তৎপরতার উন্নতি ঘটবে।

— বারবার নির্বাচন করতে গিয়ে প্রচুর লোকবল, বিশেষ করে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে। একসঙ্গে নির্বাচন হলে এই সমস্যা এড়ানো যাবে।

একসঙ্গে নির্বাচন করার পক্ষে উত্থাপিত উপরোক্ত যুক্তিগুলি খণ্ডন করার জন্যও অনেক যুৎসই যুক্তি রয়েছে। কিন্তু, একসঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে, কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভাগুলির একইসঙ্গে নির্বাচন করার আইন বলবৎ করার অর্থ হচ্ছে ভারতীয় সংবিধানের গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বেদীমূলে কুঠারাঘাত করা।

এখনকার সাংবিধানিক ব্যবস্থা হচ্ছে—যদি কেন্দ্রে কিংবা কোনও রাজ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় তবে সরকারকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয়। যদি বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা না থাকে তবে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হয়।

দেশে এ পর্যন্ত ১৬ টি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে ৭ টি ক্ষেত্রে

পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই লোকসভা নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কেন্দ্রে বা রাজ্যে জোটের মন্ত্রিসভা থাকলে জোট ভেঙে যাওয়ার কারণে সরকারের সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমাদের দেশে তা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

ভারতে যে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেখানে অর্থবিলের ওপর ভোটাভুটিতে সরকার পক্ষ হেরে গেলে সরকারকে ইস্তফা দিতে হয়। কোনও গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের পরাজয় গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী সরকারের পদত্যাগ দাবি করে। কারণ সরকার সবসময়ই আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এটাই হচ্ছে মৌলিক নীতি।

লোকসভা ও বিধানসভাগুলির একইসঙ্গে নির্বাচন করার পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়াটা গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধী। আসলে একসঙ্গে উভয় স্তরের নির্বাচন করার প্রস্তাবের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলিকে পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করার নিশ্চয়তা দিতে চাওয়া হয়েছে।

১৯৯৫ সালে বি জে পি নেতা এল কে আদবানিও এ ধরনের একটি মত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি এও বলেছিলেন যে, এমনকি কোনও সরকার যদি আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়ও, তাহলেও আইনসভা ভাঙা যাবে না। আইনসভা পূর্ণ মেয়াদ কাজ করবে। এ পরিস্থিতিতে বিকল্প সরকার গঠনের প্রয়াস চালাতে হবে, তা ফলপ্রসূ না হলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে। এই দুটো বিকল্পই গণতন্ত্র বিরোধী। কারণ, বিভিন্ন দল যাদের নিয়ে বিকল্প সরকার তৈরি হতে পারে, নির্বাচনে তারা তো সরকার পরিচালনার পক্ষে গণরায় পায়নি। তাই এটা গণতন্ত্র বিরোধী ধারণা।

আবার কোনও রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির অর্থ হচ্ছে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের পরোক্ষ শাসন। এটাও গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির লঙ্ঘন।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সুপারিশ করেছে বিধানসভা ভাঙার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন করতে হবে। তার জন্য অবশ্য সাধারণ নির্বাচন করার পক্ষে আনীত কোনও প্রস্তাব একমাত্র তখনই স্বীকৃত হবে যখন প্রস্তাবটি সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন পুষ্ট হবে। এর অর্থ হচ্ছে এভাবে নয় সেভাবে বাকি সময়ের জন্য একটি সরকারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে, যাদের পক্ষে সরকার চালানোর পক্ষে গণরায় ছিলো না। এটা সরকার গঠনে দলীয় ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে দেবে।

আলাদা আলাদা নির্বাচনে সরকারের প্রচুর অর্থ খরচ হয়। একসঙ্গে নির্বাচন হলে এই খরচ কম হবে। এই যে যুক্তিটা দেওয়া হচ্ছে এটা একেবারেই অসাড়। কারণ, নির্বাচনে সরকারি খরচের চাইতে অ-নে- ক অ - নে -ক বেশি খরচ করে রাজনৈতিক দলগুলি ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা। আসলে যেটা করা দরকার সেটা হলো নির্বাচনে অর্থশক্তির খেলা বন্ধ করতে হবে।

মোদি সরকার ও বি জে পি ভাবছে যে তারা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং , উভয় স্তরের আইনসভার নির্বাচন একইসঙ্গে অনুষ্ঠিত হলে বি জে পি সুবিধা পাবে। জাতীয়স্তরে নির্বাচনী প্রচারাভিযান বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারকে প্রভাবিত করবে এবং তাতে বি জে পি লাভবান হবে বলে তাদের ধারণা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যে রাজ্যে নানা রঙের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। বি জে পি এই বিভিন্নতার বিলোপ সাধন করতে চায়। একটা কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী সরকারের অধীন গোটা দেশে একই ধরনের রাজনৈতিক গড়নের পক্ষে বি জে পি সক্রিয় রয়েছে। সে কারণেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলির একইসঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানে উৎসাহ দেখাচ্ছে।

উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য একসঙ্গে উভয় স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করতে হবে। জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা খর্ব করা চলবে না। নির্বাচিত আইনসভার নিকট সরকারকে দায়বদ্ধ থাকতে হবে এবং সরকার আইনসভায় সংখ্যালঘু হয়ে পড়লে তাকে ইস্তফা দিতে হবে। নতুন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃত্রিমভাবে একইসঙ্গে নির্বাচনের বাস্তবতাবর্জিত ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। সাংবিধানিক ব্যবস্থা খর্ব করে, এমন যে কোনও উদ্যোগের বিরোধিতা করতে হবে।

প্রশ্ন : কেরালায় কমল সি চাভারা নামের একজন লেখককে রাষ্ট্রদোহের অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ফেসবুকে একটি পোস্টের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিজেপি যুব শাখার অভিযোগের ভিত্তিতে কেন তাকে তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো ? এটা কি মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ নয় ?

উত্তর : কমল চাভারাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে কোল্লাম জেলার বি জে পি যুব

মোর্চার কয়েকজন সদস্যের আনা অভিযোগের ভিত্তিতে। তাকে কোজিকোডে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ আধিকারিক জানান যে চাভারার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারাটিতে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এই ধারায় চাভেরার গ্রেপ্তার অবাঞ্ছিত ছিল। ফেসবুক পোস্টে যা তিনি লিখেছেন যার ভিত্তিতে অভিযোগ করা হয়েছে তাতে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা চলে না।

এ খবর জানাজানি হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, যিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরেরও দায়িত্বে রয়েছেন, চাভেরার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের ধারাটি বাদ দিতে পুলিশকে নির্দেশ দেন। পরে পুলিশের মহানির্দেশকও বলেন চাভেরার ফেসবুক পোস্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রদ্রোহের ধারা যুক্ত করা যায় না।

সি পি আই(এম) রাজ্য সম্পাদক কোদিয়াবী বালাকৃষ্ণাও এক বিবৃতিতে বলেন যে, রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিরুদ্ধ মতপোষণকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের ধারা এবং বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের ধারাগুলি ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়।

১২৪ (ক) ধারাটি গোটা দেশে কিভাবে আকছার প্রয়োগ করা হচ্ছে, এই কলামে আগে অনেক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। কাদের বিরুদ্ধে এই ধারা প্রয়োগ করা হচ্ছে? সরকারের নীতির বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন-সংগ্রাম চালান তাদের বিরুদ্ধেই রাষ্ট্রদ্রোহের ধারাটি প্রয়োগ করা হচ্ছে। কেরালাতেও ইউ ডি এফ সরকারের সময় কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইধারা প্রয়োগ করা হয়েছিলো। এই ব্যক্তিরা সিনেমা হলে জাতীয় সংগীত বাজানোর সময় উঠে দাঁড়াননি। সুতরাং রাষ্ট্রদ্রোহের ধারা জুড়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনা ঘটেছে রাজ্যের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে-ই। হিংসার উসকানি দিলেই রাষ্ট্রদ্রোহের ধারাটি প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে সুপ্রিমকোর্টের রায় থাকা সত্ত্বেও ১২৪ (ক) ধারার আকছার ব্যবহার চলেছে।

যা-ই হোক, চাভারার ঘটনায় এল ডি এফ সরকার দ্রুত হস্তক্ষেপ করে এই মামলায় ১২৪ (ক) ধারা যুক্ত না করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সি পি আই (এম) বরাবরই ভারতীয় দণ্ডবিধির রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত ধারার উপধারাগুলির ও তার অপব্যবহারের বিরোধিতা করে আসছে। এই ধারাটি ঔপনিবেশিক সরকারের দমনমূলক অস্ত্র ছিল। এখনও তা বজায় রয়েছে। বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম)'র ২১ তম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে ভারতীয় দণ্ডবিধি থেকে রাষ্ট্রদ্রোহের

ধারাটি বাতিল করার দাবি পুনরুল্লেখিত হয়েছে।

সম্প্রতি শীর্ষ আদালতের একটি রায়ে সিনেমা হলে শো শুরুর আগে জাতীয় সংগীত বাজানো এবং দর্শকদের দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সি পি আই(এম) ইতোমধ্যে শীর্ষ আদালতের এই রায়ের সমালোচনা করে বলেছে— এই রায় অনাকাঙ্ক্ষিত। রাষ্ট্রীয় হুকুম জারি করে জনগণের মধ্যে দেশ প্রেম ও জাতীয় অনুভূতি জাগানো যায় না। দুর্ভাগ্যবশত , রাজ্য সরকারগুলি শীর্ষ আদালতের এই হুকুম তালিম করতে বাধ্য। এই পরিস্থিতিতে বাম-গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার শুধু এটুকুই নিশ্চিত করতে পারে যে, এই রায় না মানার ঘটনায় যেন জেল-জরিমানার মতো কোনও আইনি ধারা ব্যবহার না করা হয়। একটা উগ্র জাত্যভিমান তৈরির জন্য বি জে পি যে দেশব্যাপী ঘৃণ্য প্রয়াস চালাচ্ছে, তাকে প্রতিহত করতে হবে।

প্রশ্ন: ভারতের সংবিধান হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সংবিধানের একটি ধারায় বলা হয়েছে, সংবিধান গৃহীত হওয়ার ১৫ বছরের মধ্যে সংসদে আইন পাস করে ইংরেজি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। পাশাপাশি, রাজ্যগুলিও সংশ্লিষ্ট বিধানসভায় আইন করে অপর একটি ভাষাকে ঐ রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারে। এটাই কি উৎকৃষ্ট ভাষা নীতি ?

উত্তর:- ভারতবর্ষ একটি বহু ভাষাভাষী দেশ — এই বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে সি পি আই (এম) দেশে একটি গণতান্ত্রিক ভাষা নীতি প্রবর্তনের পক্ষে। জাতীয় স্তরে সমস্ত স্বীকৃত ভাষাগুলির সমমর্যাদাই হবে এই ভাষা নীতির ভিত্তি। সংবিধানের ৮ম তপশিলে এ ধরনের ২২ টি জাতীয় ভাষার একটি তালিকা রয়েছে।

জাতীয় স্তরে স্বীকৃত ভাষাগুলির মধ্যে সাম্যের অর্থ হল, ভাষাগুলি সর্বত্র সমান মর্যাদা পাবে এবং দেশের সংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনে এই ভাষাগুলি সমানভাবে ব্যবহৃত হবে। দেশের সমস্ত আইন, সরকারি ঘোষণা, সরকারি প্রস্তাব সমস্ত জাতীয় ভাষায় মুদ্রিত হবে। সরকারি নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় লোক সেবা আয়োগকে বিভিন্ন পরীক্ষা পরিচালনায় জাতীয় ভাষাগুলি যাতে সমান গুরুত্ব পায় তা দেখা উচিত।

অন্য সব ভাষাকে উপেক্ষা করে শুধু হিন্দি ভাষাকেই সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহার

বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়। অন্যান্য ভাষাগুলিকে সমমর্যাদা দিয়ে ভাষাগুলির ক্রমোন্নতি ঘটিয়ে, একসময় হিন্দি ভাষাকে সারা দেশে যোগাযোগের সাধারণ ভাষা হিসাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যাবে। আর ইংরেজি ভাষা কেন্দ্রীয় স্তরে ততদিনই চলতে পারে, যতদিন হিন্দি ভাষাভাষী জনগণ এর অনুমোদন করেন।

গণতান্ত্রিক ভাষা নীতির অর্থ হল, জনগণের মাতৃভাষায় সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভের অধিকার। শিক্ষাক্ষেত্রে ও প্রশাসনে কোন রাজ্যের প্রধান ভাষা হওয়া উচিত সংশ্লিষ্ট রাজ্য ভাষাটি। পাশাপাশি , ঐ রাজ্যের ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষাও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলন করে সেই ভাষার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের মত বহু ভাষাভাষীর দেশে সব রাজ্যেই কম বেশি ভাষাগত সংখ্যালঘু রয়েছে। এই সমস্ত ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে।

এই বোঝাপড়া থেকেই সি পি আই (এম) দলের কর্মসূচির প্যারা ৬.৩ (iv) এর জনগণতান্ত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসাবে বিকল্প ভাষা নীতি হিসাবে নিম্নোক্ত প্যারাটি স্থান পেয়েছে:

“ লোকসভা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনে সকল জাতীয় ভাষাগুলির সমতা স্বীকৃত হবে। লোকসভা সদস্যদের যে কোন জাতীয় ভাষায় বক্তৃতা দেবার অধিকার থাকবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তা অন্যান্য সকল জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা থাকবে। সমস্ত জাতীয় ভাষায় সমস্ত আইনের সরকারি আদেশগুলির এবং প্রস্তাবগুলির অনুবাদ পাওয়া যাবে। অন্যান্য ভাষাকে বাদ দিয়ে - সরকারি ভাষারূপে একমাত্র হিন্দির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হবে না। কেবলমাত্র সমস্ত ভাষাগুলিকে সমমর্যাদা দেয়ার মধ্য দিয়েই হিন্দি সারা দেশের যোগাযোগের ভাষা রূপে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। ততদিন পর্যন্ত হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা বজায় থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার জনগণের থাকবে। সমস্ত সরকারি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ভাষা রূপে নির্দিষ্ট ভাষাভাষী রাজ্যের ঐ নির্দিষ্ট ভাষার ব্যবহার সুনিশ্চিত করা হবে। প্রয়োজনে এক বা একাধিক সংখ্যালঘু জনগণের অথবা একটি অঞ্চলের ভাষার ব্যবহার কার্যকরী করা হবে। উর্দু ভাষা ও তার বর্ণলিপিকে রক্ষা করা হবে।”

প্রশ্ন : সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা "বিকল্প গর্ভধারণ (নিয়ন্ত্রণ) বিল" নামে একটি বিলের অনুমোদন দিয়েছে। এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী নানা মত উঠে আসছে। এ সম্পর্কে আমাদের পার্টির অবস্থান কি?

উত্তর : গত ২৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই বিল অনুমোদন করেছে। তবে সংসদে বিলটি পেশ করার আগে একটি সিলেক্ট কমিটিতে এটা যাবে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিল। তাই সমাজের সকল অংশের মতামত ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রস্তাব, সংশোধনী, মন্তব্য ইত্যাদি জানা দরকার। সিলেক্ট কমিটি এসব বিচার-বিবেচনা করার পর সংসদে পেশ করার জন্য বিলটি চূড়ান্ত করা হবে।

বিকল্প গর্ভধারণের বিষয়টি একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। নিঃসন্তান দম্পতিদের কাছে এই পদ্ধতিটি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। গর্ভধারণে সক্ষম কোনও মহিলার ডিম্বাশয়ে ইনজেকশনের মাধ্যমে পুরুষের বীর্য স্থাপন করা হয়। তার থেকে সন্তান জন্ম নেয়। বিকল্প গর্ভধারিণী মহিলা শিশুটির মা হতেও পারেন, নাও হতে পারেন। সন্তান পেয়ে নিঃসন্তান দম্পতিরা খুশি হন বটে, কিন্তু তাদের প্রচুর পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয়। চিকিৎসকরা শুধু পরিসেবার খরচই নেন না, এমন কি বিকল্প গর্ভধারিণী মহিলাও যোগান দিয়ে থাকেন। তার ফলে এই চিকিৎসকরা অতি মুনাফা অর্জনে সক্ষম হন। বিকল্প গর্ভধারিণী মহিলারা সাধারণত গরিব, নিরক্ষর কিংবা অল্পশিক্ষিত অংশের। এই কাজের জন্য ব্যবহৃত মহিলারা অল্প কিছু অর্থ পেলেই সন্তুষ্ট হন। বাকিটা এই ব্যবসায় যুক্ত ব্যক্তিদের পকেটে যায়। এভাবে মানুষ জন্মাবার ব্যাপারটা একটা বড় ধরনের লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। যেমনি ঠকানো হয় বিকল্প গর্ভধারিণী মায়েদের, তেমনি ঠকানো হয় নিঃসন্তান দম্পতিদের।

আমাদের পার্টি বরাবর এই বিকল্প সন্তান প্রজনন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছে। আইন করতে হবে যাতে এই পদ্ধতিকে ব্যবসায়িক লেনদেনে পর্যবসিত না করা যায়। এই পদ্ধতিকে অনেক সময় 'গর্ভাশয় ভাড়া' দেওয়ার কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। এটা নিয়ন্ত্রণমুক্তভাবে চলতে পারে না। মনে রাখতে হবে এই বিকল্প গর্ভধারণের পদ্ধতি বহু দেশে নিষিদ্ধ। যেমন, অস্ট্রেলিয়া, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইনস, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ব্রিটেন, থাইল্যান্ড ও নেপালে এই পদ্ধতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত এই বিলের একটি ভালো দিক হচ্ছে, এ পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনও আর্থিক লেনদেনের সুযোগ থাকবে না।

প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিসেবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন সেটাই দেওয়া-নেওয়া চলবে। সমাজের গরিব অংশের মহিলাদের যেভাবে শোষণ করা হচ্ছে তা প্রতিহত করতে হবে। আমাদের দেশে এই ব্যবসায় বছরে ২,৫০০ কোটি টাকারও বেশি লেনদেন হয়।

যারা বলেন যে গরিব মহিলাদের জীবনধারণের জন্য তাদের কাজের 'পছন্দ' খুঁজে নেওয়ার অধিকার আছে, সেই অর্থে 'বিকল্প গর্ভধারিণী' হওয়াটাও একটা আয়ের উপায়। সুতরাং এটা বাধা দেওয়া যায় না। এসব যুক্তির প্রবক্তাদের সঙ্গে আমরা একমত নই। এই যুক্তি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ' বিক্রির ব্যবসার নির্মম চিত্র আমাদের অজানা নয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি কিংবা গর্ভাশয় ভাড়া দিয়ে গরিবদের জীবিকা উপার্জনের 'অধিকার' দেওয়া চলে না এবং দেওয়া উচিতও নয়।

বিলের কয়েকটি ধারা সম্পর্কে অবশ্য আমাদের ভিন্নমত রয়েছে। বিকল্প পদ্ধতিতে জন্ম নেওয়া সন্তানের পিতৃত্ব/মাতৃত্বের অধিকার কোনও একক পুরুষ বা একক মহিলা কিংবা সমলিঙ্গের দম্পতিকে না-দেওয়ার আমরা বিরোধী। স্মরণে রাখতে হবে যে এই ক্যাটাগরির ব্যক্তিরা কিন্তু শিশু দত্তক নেওয়ার অধিকার ভোগ করেন। তাহলে বিকল্প পদ্ধতিতে জন্ম নেওয়া শিশুর পিতৃত্ব/মাতৃত্বের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে কেন?

বিলের এই ধারাগুলি পশ্চাদ্‌মুখী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত, যেমনটা সুষমা স্বরাজের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট হয়েছে। সুষমা স্বরাজ এই বিল প্রণয়নকারী মন্ত্রিগোষ্ঠীর সদস্যা। তিনি বলেছেন দেশে বিদ্যমান সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রথা ও নৈতিকতা বিবেচনা করেই এই ধারাগুলি সংযোজিত হয়েছে।

বিলে আরেকটি ধারায় বলা হয়েছে, কোনও দম্পতির যদি এক সন্তান থাকে, তা প্রাকৃতিক নিয়মে হোক বা কৃত্রিম উপায়ে হোক, তাহলে বিকল্প উপায়ে জন্ম নেওয়া দ্বিতীয় সন্তান তার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। সেই ধারাতেই বলা হয়েছে বিয়ের পাঁচ বছর পরই একমাত্র নিঃসন্তান দম্পতি কৃত্রিম উপায়ে শিশু গ্রহণের অধিকার পাবে। সে ক্ষেত্রে অবশ্য দম্পতির একটি ন্যূনতম বয়স ধার্য করা হয়েছে। এসব বাধা- নিষেধ আরোপ করা সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গত ও অযৌক্তিক।

বহুবার আমরা দাবি করেছি যে বিকল্প গর্ভধারিণী মায়ের সুস্বাস্থ্য ও জন্ম নেওয়া সন্তানের আইনি অধিকার কঠোরভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে। আমাদের মনে হয় এই বিল প্রণয়নে এ সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে বিকল্প গর্ভধারিণী মায়ের স্বাস্থ্যের দিকটি বিলে সম্ভবত স্থান পায়নি।

যেমনটা আশা করা গিয়েছিল সেটাই হচ্ছে। যেসব সংগঠন ও সমিতি মানব শিশু জন্ম দেওয়ার এই বিকল্প পদ্ধতির লাভজনক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত , তাদের দিক থেকেই এই বিল নিয়ে ব্যাপক হৈ চৈ করা শুরু হয়েছে। তারা যেমন বলছে এ ধরনের ব্যবসা জীবিকা উপার্জনের একটা উপায় হিসেবে কোনও মহিলার বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে, তেমনি তারা বলছে বিলের কিছু ধারার কঠোরতা, ধর্মান্তরণ ও সন্তান অর্জনে অক্ষম মহিলাদের পরিত্যাগ করতে স্বামীদের প্ররোচিত করবে। আমাদের সমাজে সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম মহিলাদের বিরুদ্ধে যে অমর্যাদাকর আচরণ করা হয়ে থাকে তা কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ও বাণিজ্যিক এই কৃত্রিম পদ্ধতির উপর নির্ভর করছে না।

বিপদ হচ্ছে, এই বিলের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী লবি সক্রিয় রয়েছে যারা এই অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা থেকে বিশাল মুনাফা অর্জন করছে। এরা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে এই বিল প্রত্যাহারের জন্য। বিলে এই বিকল্প প্রজনন পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না। শুধু আর্থিক লেনদেনের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে মাত্র। আমাদের পার্টি এ ধরনের চাপ সৃষ্টির বিরোধিতা করবে এবং অন্যদেরও অতিরিক্ত মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করবে।

প্রশ্ন: গত মাসে কেরালার জঙ্গলে পুলিশের গুলিতে দু'জন মাওবাদী নিহত হয়। সি পি আই রাজ্য সম্পাদক ও রাজ্যের মানবাধিকার কর্মীরা এই ঘটনাকে সাজানো সংঘর্ষ দাবি করে এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছে। এ ধরনের ঘটনায় অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলি পুলিশের পক্ষ নিয়ে যে ধরনের অবস্থান নেয়, কেরালার বামফ্রন্ট সরকারও একই ধরনের অবস্থান নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এক্ষেত্রে সি পি আই (এম)'র অবস্থান ব্যাখ্যা করবেন ?

উত্তর: গত কয়েক বছর যাবত কেরালা, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের সীমান্তের ত্রিসঙ্গম এলাকার জঙ্গলে কয়েকটির মাওবাদী দল অপারেশন করছিল। তারা সংলগ্ন ওয়েনাদ বনাঞ্চলে ফরেস্ট অফিসাদের উপর আক্রমণ, গ্রামবাসীদের বাড়ি-ঘর ভাঙচুর এবং সরকারি কর্মচারীদের হুমকি দিচ্ছিল। এসব ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতেই কেরালা পুলিশ এদের ধরতে ঐ অঞ্চলে টহলদারি চালায়। কু পুস্বামী নামে মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য ও অজিতা নামে অপর একজন মাওবাদী কর্মী গুলিতে নিহত হওয়ার আগে পুলিশের অভিযানে রাজ্যে অন্য কোন মাওবাদী সদস্য নিহত বা গ্রেপ্তার হওয়ার

ঘটনা ঘটেনি। উপরোক্ত দু'জন নিহত হয়েছিলেন পশ্চিমঘাটের নীলাম্বুর বনাঞ্চলে।

এই ঘটনায় পুলিশের বক্তব্য হল: পুলিশ তাদের আস্তানা খুঁজে বের করার পর পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে তাদের মৃত্যু হয়। মাওবাদীরা হল অতিবামপন্থী উগ্রপন্থী দল যারা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করে। অন্যান্য নকশাল দলগুলির সঙ্গে মাওবাদীদের পার্থক্য হল, এরা যাদেরকেই তাদের রাজনৈতিক শত্রু বলে মনে করে তাদেরকে সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করে। বছরের পর বছর তাদের এই ভ্রান্ত রাজনীতির পরিণাম স্বরুপ দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু বামপন্থী কর্মী নিহত হয়েছেন। অখণ্ডিত অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে বিগত কয়েক বছরে সি পি আই (এম) সশস্ত্র মাওবাদীদের হাতে তাদের বহু কর্মীকে হারিয়েছে।

মাওবাদীদের অমানবিক সন্ত্রাস ও শাসকদলের সঙ্গে যোগসাজসের ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত হলো, পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদীদের সি পি আই (এম) কর্মীদের গণহত্যার অভিযানগুলি। ২০০৯ থেকে ২০১১ সালে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মাওবাদীরা জঘন্য কায়দায় দুশো'র বেশি সি পি আই (এম) কর্মী- সমর্থককে হত্যা করে। সি পি আই, কেরালা রাজ্য সম্পাদক যেমনটা মনে করেন, সি পি আই (এম) এই সশস্ত্র মাওবাদী বাহিনীগুলিকে জনযুদ্ধা বা জনগণের স্বার্থে লড়াকু বাহিনী বলে মনে করে না। সি পি আই (এম) সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে লড়াই করেই মাওবাদীদের জনবিচ্ছিন্ন করা হবে। কেরালায় অবশ্য সি পি আই (এম) ও বামপন্থীদের শক্তিশালী অবস্থানের কারণে রাজ্যে মাওবাদীরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি।

তবে, পার্টি সর্বদাই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে সাজানো গুলি বিনিময়ের মাধ্যমে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে মাওবাদীদের নির্মূল করার বিরোধী । ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যে, মাওবাদীদের প্রতিহত করার অজুহাতে সরকার বস্তুত নিরপরাধ উপজাতি জনগণের উপরই ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়েছে।

নীলাম্বুর বনাঞ্চলের ঘটনার তদন্তের জন্য রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ঘটনার অব্যবহিত পরেই ম্যাজিস্টেট পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। গুলি বিনিময়ে হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুসারেই এই তদন্তাদেশ করা হয়েছে। উপরন্তু রাজ্যের সি আই ডি ও এর আলাদা তদন্ত করেছে। এই তদন্তের ফলে সত্যিকারে কি ঘটেছিল তা বেরিয়ে আসবে। এই তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার আগে সি পি আই (এম) এই ঘটনার উপর কোন পূর্বানুমান করতে চায় না।

প্রশ্ন: সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি এক নির্দেশ জারি করেছে, সমস্ত সিনেমা হলে ছবি শুরুর আগে জাতীয় সংগীত বাজাতে হবে, এবং জাতীয় সংগীত চলাকালে সিনেমা হলে উপস্থিত সমস্ত দর্শককে উঠে দাঁড়াতে হবে। এই ব্যবস্থা জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগাতে মোটেই সাহায্য করবে? এই প্রশ্নে সি পি আই (এম)'র দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর: সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, দেশের সমস্ত সিনেমা হলে ছায়াছবি শুরুর পূর্বে জাতীয় সংগীত বাজাতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, সে সময় সিনেমা হলে উপস্থিত সকল দর্শককে জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উঠে দাঁড়াতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যক বেঞ্চ তাদের রায়দানকালে বলেছে "সময় এসেছে, দেশের জনগণকে উপলব্ধি করতে হবে যে তারা একটি দেশের অধিবাসী এবং সে দেশের জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা তাদের কর্তব্য। আর এটা হল নাগরিকদের সাংবিধানিক দেশপ্রেম ও তাদের সহজাত জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতীক।"

দেশভক্তি ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাবার লক্ষ্যে বিচার বিভাগ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া দেশপ্রেম পরীক্ষার ব্যবস্থা সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এইভাবে নির্দেশ দিয়ে জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার মতো জাতীয় প্রতীকের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাবোধ বাড়ানো যায় না। দেশের নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটিয়েই এই শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে হবে।

উপরন্তু, সমস্ত সিনেমা হলে প্রতিটি ছবির প্রদর্শনীর আগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের বিচারবিভাগীয় এই নির্দেশের পেছনে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তির অবতারণা করা হয়নি। অবসর ও বিনোদনের জন্যই জনগণ সিনেমা হলে যান। দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিউড ও হলিউড মার্কা ছবির দর্শকদের দেশপ্রেম যাচাই করার এই ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার মধ্যে হাস্যকরভাবে নাগরিকদের একান্ত নিজস্ব পছন্দ ও সাংবিধানিক দেশপ্রেমের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে।

এই নির্দেশ অমান্য করে জাতীয় সংগীত চলাকালে যারা উঠে দাঁড়াবে না তাদের বিরুদ্ধে এই রায়ে কোন শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। কিন্তু আমরা জানি, জনগণকে ভীতি প্রদর্শন ও সাজা দেয়ার জন্য এর অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেরালার ত্রিবান্দ্রমে এরকম একটি ঘটনায় সিনেমা হলে সিনেমা শেষে জাতীয় সংগীত চলাকালে উঠে না দাঁড়ানোয় কতিপয় ব্যক্তিকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার জনগণের উপর দেশপ্রেম চাপিয়ে দেয়ার যে ভাবাবেগ পূর্ণ প্রচার

শুরু করেছে, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় তাদের সে উন্মাদনায় পূর্ণ মাত্রা পাবে। সি পি আই (এম) মনে করে, সুপ্রিম কোর্ট তাদের এই রায় পুনর্বিবেচনা করলেই ভাল।

প্রশ্ন: ভারতের অর্থ ব্যবস্থাকে নগদহীন অর্থ ব্যবস্থায় (যেখানে সব ধরনের আর্থিক লেনদেন হবে সর্বাধুনিক মোবাইল সেট বা কম্পিউটারের সাহায্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে) রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগকে সি পি আই (এম) কিভাবে দেখছে?

উত্তর: নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে মোদি সরকার জনগণের উপর যে ভাবে জবরদস্তি করে ডিজিট্যাল লেনদেন (Digital transaction) চাপিয়ে দিতে চাইছে, সি পি আই (এম) তার বিরোধিতা করে।

প্রথমত, ভারতীয় জনগণের বিশাল অংশ অসংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। দেশের ৪০ কোটি জনতা দিনমজুর, যাদের আয় দৈনিক ৩০০ টাকার বেশি নয়। এছাড়া বাগিচা, বিড়িসহ প্রচলিত শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে যে সব শ্রমিক রয়েছে তাদের কাজের নিশ্চয়তা নেই। এবং তাদের মজুরিও কম। তাদের অনেকেই নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিত। আর রয়েছে লক্ষ লক্ষ ফেরিওয়ালা যারা গ্রাম -শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সবজি , ফল, পোশাক, গৃহস্থালি সামগ্রী বিক্রির স্বনিযুক্ত পেশায় যুক্ত। রয়েছে বিভিন্ন পরিসেবা প্রদান যথা - যানবাহনের টায়ার সারাই, সাইকেল মেরামত, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত , ধোপা, দর্জি। এরা সবাই তাদের মজুরীর জন্য নগদ অর্থের উপর নির্ভরশীল। কারণ তাদের মজুরির পরিমাণ খুব সামান্য। এই ধরনের পেশায় যুক্ত শ্রমিকরা পেশাটিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাকিতে পরিসেবা প্রদান করতে বাধ্য হন। নগদ টাকার লেদদেন ছাড়া এই ধরনের পেশায় যুক্ত জনগণের জীবিকা অর্জন অসম্ভব। বস্তুত, নরেন্দ্র মোদির নোট বাতিল কাণ্ডে উদ্ভূত সমস্যায় এই অংশের জনগণই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন।

আমাদের দেশের অর্ধেকের বেশি জনশক্তি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তারা শুধু কৃষক, কৃষি শ্রমিক, পশুপালক, দুগ্ধজাত সামগ্রীর বিতরকই নয়, গ্রামীণ জনশক্তির অংশ হিসেবে আনুষঙ্গিক নানা ধরনের পেশায় যুক্ত থেকে তারা কৃষি ও দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে পরিসেবা প্রদান করে। এই জনশক্তির চাহিদা একমাত্র নগদ অর্থের মাধ্যমেই মেটানো সম্ভব। ডিজিটাইজেশন বা ডিজিট্যাল লেনদেন তাদের কাছে কিছুতেই উপযোগী হতে পারে না। অনেক ঢাক- ঢোল পিটিয়ে যেসব গ্রামগুলিকে ক্যাশলেস বা 'নগদহীন' গ্রাম

বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, যেমন জম্মু ও কাশ্মীরের লনুরা, মধ্য প্রদেশের বড়ঝারী, তেলেঙ্গানায় ইব্রাহিমপুর, হরিয়ানার ঝাটিপুর, ছত্তিশগড়ের ঝারিয়া ইত্যাদি গ্রামগুলির বাসিন্দারা এতই দারিদ্র্যক্লিষ্ট যে ইন্টারনেট লেনদেনের (Digitised transaction) ব্যাপারটি কি তাই তারা জানে না। ২৩ ডিসেম্বর তারিখে 'হিন্দুস্থান টাইমস' এক প্রতিবেদনে জানায়, উপরোক্ত গ্রামগুলির কোথাও ডিজিট্যাল লেনদেন হচ্ছে না।গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, সেখানে স্মার্টফোন নেই, ব্যাংকের শাখা অপর্যাপ্ত এবং ইন্টারনেট সংযোগ অত্যন্ত দুর্বল।

ডিজিট্যাল ব্যবস্থায় টাকা প্রদানে স্মার্টফোন আবশ্যক। দেশের মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের মাত্র ২০ শতাংশের হাতে স্মার্টফোন রয়েছে। ন্যূনতম নির্দিষ্ট আয় ও শিক্ষার মানের অধিকারীদের মধ্যেই স্মার্টফোন ব্যবহার সীমাবদ্ধ। বিমুদ্রাকরণের ফলে চা- বাগান শ্রমিকদের দুর্দশার কথা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে রিজার্ভ ব্যাংক সম্প্রতি তাদের মজুরি চেক-র মাধ্যমে প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছে। আর এতে তাদের সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। শ্রমিকদের কারোরই স্মার্টফোন নেই। তাদের ৯০ শতাংশের কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। উপরন্তু, এসব বাগান এলাকায় ব্যাংক শাখাও খুবই অপর্যাপ্ত। এটাই কি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উপায়?

স্মার্টফোন হাতে পাওয়া এবং ডিজিট্যাল ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সমস্যা হল মূল সমস্যার একটি দিক মাত্র। বাস্তব হল, দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে তীব্র বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে। আর এটা সবারই জানা, বিদ্যুৎ ব্যতিত ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এমনকি বিদ্যুতায়িত অঞ্চলেও ইন্টারনেট সংযোগ অত্যন্ত অসন্তোষজনক।

ডিজিট্যাল লেনদেন বিনামূল্যে হয় না। এই ব্যবস্থায় লেনদেনের মোট টাকার ০.৬ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ কেটে রাখা হয়। ডিজিট্যাল পেমেন্টে সুবিধা ঘোষণা করে, বিমুদ্রাকরণের মাধ্যমে মুদ্রার সংকট তৈরি করে গরিব জনগণের ঘাড়ে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী কায়দায় অনৈতিকভাবে এই বিশাল পরিমাণ আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। অবশ্যই সরকারের এই চাপিয়ে দেয়া ডিজিট্যাল ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে ডিজিট্যাল পরিসেবা প্রদানকারী কোম্পানিগুলি। আর এই কোম্পানিগুলির মধ্যে পে টি এম (Paytm) হল এমন একটি সংস্থা যাকে কেন্দ্রীয় সরকার বেপরোয়াভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ জনগণের উপর আরও বুলডজার চালানোর পথে অগ্রসর হচ্ছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, ২০১৭ সালের মার্চের মধ্যে দেশের

তিন লক্ষ ন্যায্য মূল্যের দোকানের সবগুলিকে ডিজিট্যাল ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। বর্তমানে মাত্র ৩৮০০০ টি ন্যায্য মূল্যের দোকানে এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, তা হবে গরিব জনগণের সস্তায় রেশন সামগ্রী পাওয়ার অধিকারের উপর আরেকটি অমানবিক ও নির্মম আক্রমণ। ডিজিট্যাল ব্যবস্থার মধ্যেই প্রতারনার সম্ভাবনা হল আরেকটি বড় বিপদ। গত বছর অক্টোবরে দেশের ৩২ লক্ষ এ টি এম অ্যাকাউন্ট 'হ্যাক' (তথ্য পাচার) হয়ে গেছে। আমাদের দেশে ডিজিট্যাল সিস্টেমে নিরাপত্তার ব্যবস্থা সমূহ অত্যন্ত নিম্নমানের এবং ডিজিট্যাল প্রতারনার জন্য ভারত খুবই উর্বর ক্ষেত্র।

সি পি আই (এম) মনে করে, শাস্তির খাড়া ঝুলিয়ে জবরদস্তি করে দেশে ডিজিট্যাল ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া একটি জনবিরোধী ও গরিব বিরোধী পদক্ষেপ। এই ব্যবস্থা জনগণের অধিকার খর্ব করবে, দেশের হত দরিদ্র জনগণকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবে, এই ব্যবস্থায় লেনদেনে কমিশন ও অন্যান্য চার্জ আদায়ে র মাধ্যমে জনগণের কাঁধে আর্থিক বোঝা বৃদ্ধি করবে, স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ ও পছন্দমত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে জনগণের সামনে বাধা হয়ে দাড়াবে, বিপজ্জনকভাবে জনগণকে ইন্টারনেট বঞ্চনার সম্ভাবনার মুখে ঠেলে দেবে এবং অনবরত জনগণের ব্যক্তিগত গোপন ক্ষেত্রগুলিতে সাইবার অনুপ্রবেশ ঘটাতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন: এসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্ম (এ ডি আর) নামের একটি এন জি ও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলে প্রচুর পরিমাণ অর্থ আসে অজ্ঞাত উৎস থেকে — এই মর্মে পর পর যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতে সি পি আই (এম)'র নামও রয়েছে। যদি এটা সত্যি হয় তা হলে সি পি আই (এম) কেন তার তহবিলে জমা পড়ার উৎসগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরছে না।

উত্তর: এ ডি আর নামক সংস্থাটি প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। নির্বাচন কমিশন থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলির তহবিল সংক্রান্ত বিষয় এই প্রতিবেদনের মুখ্য বিষয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য তার বাৎসরিক আয় - ব্যয়ের অডিট করা হিসাব আয়কর দপ্তরকে জানানো বাধ্যতামূলক। নির্বাচন কমিশনকেও

একই তথ্য জানাতে হয়।

সি পি আই এম'র তহবিলে 'অজ্ঞাত উৎস' থেকে চাঁদা আসার প্রশ্নটি পার্টির তহবিল গড়ার প্রকৃতি এবং চাঁদা সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অজ্ঞতার কারণে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। আয়কর দপ্তরের নিয়মানুযায়ী ২০ হাজার টাকা বা তার বেশি চাঁদাদাতাদের নামধাম সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ওই দপ্তরের রিটার্নে জমা দিতে হয়। তাতে নাম, ঠিকানা, চাঁদাদাতার প্যান কার্ড নম্বর জমা দিতে হয়। সি পি আই (এম)'র ক্ষেত্রে এই অঙ্কের ব্যক্তিগত চাঁদার পরিমাণ পার্টির মোট আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। যেমন ধরুন, ২০১৪- ১৫ সালে সি পি আই (এম) ২০ হাজার টাকার বেশি ব্যক্তিগত চাঁদা পেয়েছে ৩.৪২ কোটি টাকা। এটা পার্টির মোট আয় ১২৩.৯২ কোটি টাকার মাত্র ৬ শতাংশ। ২০১৫- ১৬ সালে এ ধরনের ব্যক্তিগত চাঁদা সংগৃহীত হয়েছে ৬১ জনের কাছ থেকে। যার পরিমাণ ১.৮১ কোটি টাকা।

পার্টির তহবিলের বড় অংশ আসে তিনটি উৎস থেকে: (১) পার্টি সভ্যদের সভ্যপদের ফিস ও লেভি, (২) ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা , যাদের যথাযথ রসিদ দেওয়া হয় এবং চাঁদাদাতাদের নাম নথিভুক্ত থাকে, (৩) বক্স, পতাকা, ডিব্বি-র মাধ্যমে গণঅর্থ সংগ্রহ অভিযান।

সি পি আই (এম)'র অর্থ সংগ্রহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যা অন্যান্য রাজনৈতিক দলে নেই, তা হছেছ পার্টি সভ্যদের আয়ের উপর মাসিক লেভি দিতে হয়। পার্টি সভ্য সংখ্যা এখন ১০ লক্ষ ৬০ হাজারেরও বেশি। প্রত্যেক পার্টি সভ্যকে তার আয়ের উপর নির্ধারিত হারে লেভি দিতে হয়। এই উৎস থেকে পাওয়া অর্থের পরিমাণ মোট আয়ের গড়পরতা ৪০ শতাংশ। লেভি জমা দিলে রসিদ দেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট কমিটি তার হিসাব রাখে। যেহেতু এসব বিস্তৃতভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা সম্ভব নয়, সে কারণে একে 'অজ্ঞাত উৎস' থেকে আয় বলে উল্লেখ করা অসঙ্গত।

পার্টির মোট আয়ের ৫০ শতাংশের বেশি সংগৃহীত হয় পাটি দরদি ও সাধারণ মানুষের স্বেচ্ছাদান থেকে। এই জনগণের বেশিরভাগই শ্রমিক শ্রেণী ও গরিব অংশের, যারা সি পি আই (এম)-কে অর্থ সাহায্য করে থাকেন। তাদের শ্রেণীগত অবস্থান ও আয়ের নিরিখে বিচার করলে তাদের স্বেচ্ছাদানের পরিমাণ কমই হবে, সাধারণভাবে

এক হাজার টাকার কমই হয়। এ ধরনের দান গ্রহণেও রসিদ /কুপন ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এই সংগ্রহের যথাযথ রেকর্ড পার্টির বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে থাকে।

আর, বাক্স, ডিব্বি বা পতাকা নিয়ে যখন গণঅর্থ সংগ্রহ অভিযান চালানো হয় কিংবা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান বা অন্য সামগ্রীতে পার্টি তহবিল সংগ্রহ করা হয় তখন সাধারণভাবে সকলকে ব্যক্তিগতভাবে রসিদ/ কুপন দেওয়া যায় না। কিন্তু ব্রাঞ্চ বা লোক্যাল কমিটি তার সম্যক হিসাব রাখে এবং হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

সুতরাং, সি পি আই (এম)'র তহবিল গড়ে ওঠে ' অজ্ঞাত সূত্র' থেকে অর্থ আসার ওপর — একথা বলাটা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর ও ভুল।

মূল প্রশ্নটা এখানে নয়, মূল ইশ্যুটি হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির এমন অর্থ সম্পর্কিত যা আইনসিদ্ধভাবে সংরক্ষিত হিসাবের আওতায় থাকে না। এটাই হচ্ছে বেআইনি অর্থ যার ওপর লাগাম টানা দরকার এবং নির্বাচনের সময় কালো টাকা ব্যবহার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।